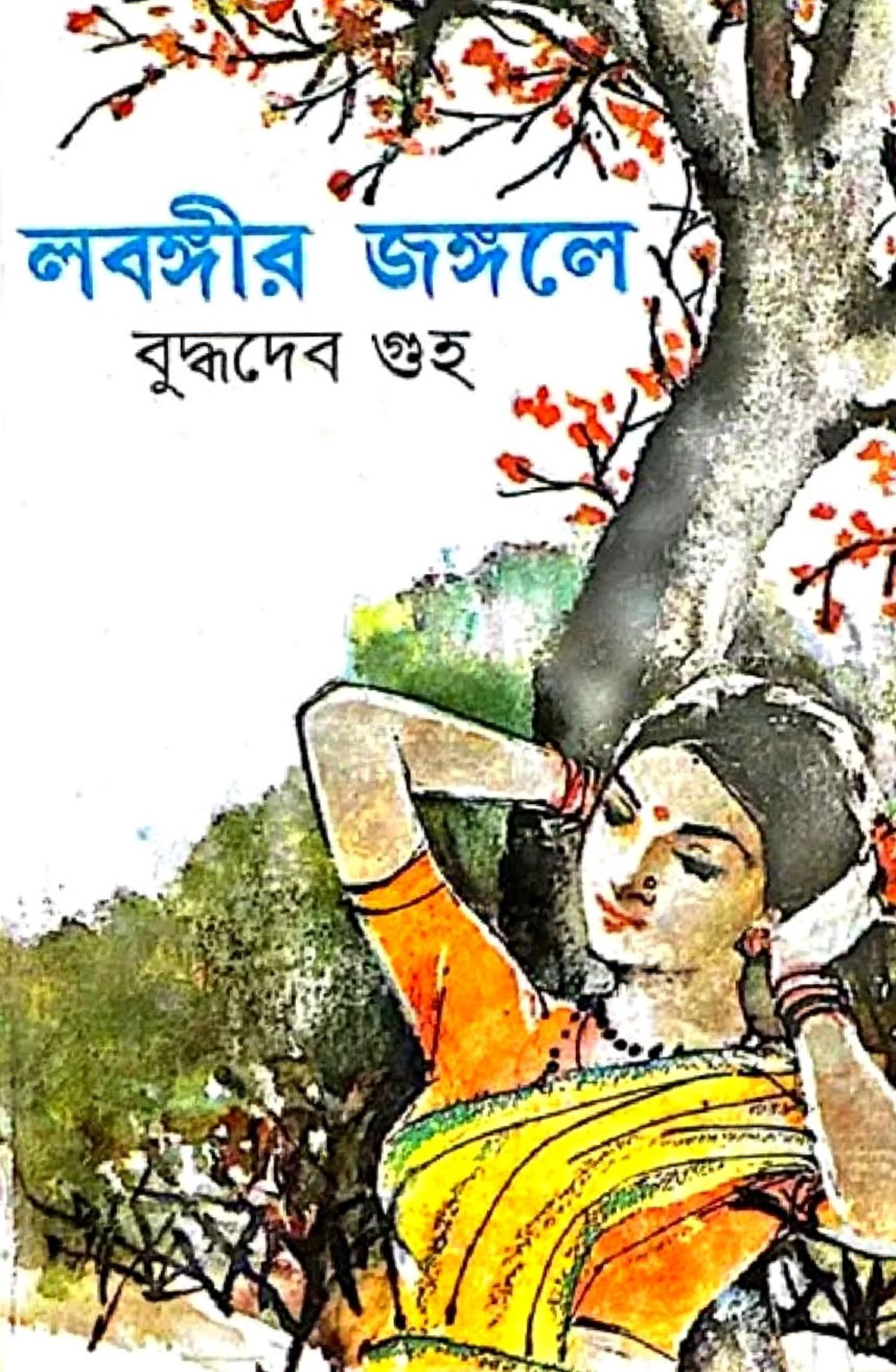

লবঙ্গীর জঙ্গলে
বুদ্ধদেব গুহ

লবঙ্গীর জঙ্গলে

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

জঙ্গল-পাগল কানুদা, খুকুদি এবং মনিদিকে ,

অকৃপণ প্রীতির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

অফিস থেকে ফিরেই, লেখার টেবিলে একটা পোস্টকার্ড দেখলাম।

জামা-জুতো না খুলেই চেয়ারে বসে পোস্টকার্ডটা তুলে নিলাম। অত্যন্ত খারাপ হস্তাক্ষরে ও খারাপ ইংরিজীতে লেখা একটা চিঠি। কোন পোস্ট-অফিসের ছাপ পড়েছে তাতে তাও বোঝা গেল না।

চিঠিটা এই রকম ঃ

ভাই,

আমি বিড়িগড়ের চন্দনী। সেই যে চন্দ্রকান্ত ও আমাকে তুমি মহানদীর বুকে ভেলায় ভাসিয়ে বিদায় দিয়েছিলে তারপর তোমার কোনোই খোঁজ জানি না। তোমাকে আমার খুব দরকার। ভীষণ বিপদ আমার। যদি একবার আসতে পারো তাহলে বড় ভালো হয়। এলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি টিকড়পাড়ায় এসে রয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। কিন্তু তুমি কি আর আসবে?

ইতি—তোমার চন্দনী।

চিঠিটা পড়ে প্রথমে রাগ হলো। জঙ্গল-পাহাড়ের এরা কি ভাবে? আমরা কি কোলকাতায় ভেরাণ্ডা ভাজি যে, এসো বললেই আসতে পারি? তার উপর একটি যুবতী মেয়ে, যার সঙ্গে দশপাল্লা রাজ্যের খন্দ্‌মালের বিড়িগড়ের পাহাড়ে আমার অল্পদিনের পরিচয়—সে কোন সুবাদে আমাকে এমন করে চিঠি লেখে। যেন আমার ভরসাতেই সে চন্দ্রকান্তকে বিয়ে করেছিল, আমার ভরসাতেই ঘর পাততে গেছিল তার সঙ্গে।

ভাবছিলাম, চিঠিটাই বা কাকে দিয়ে লেখাল? ইংরিজী তো দূরস্থান, ওড়িয়াও লিখতে পারে বলে জানি না। কিন্তু অক্ষর পরিচয় না থাকলেও তাকে অশিক্ষিত বলতে পারি না। চন্দনীর একটা সহজাত

এবং অভিজাত শিক্ষা ছিল, বনপাহাড়ের রাজকুমারীর মতো।

চন্দ্রকান্ত ঘরে থাকার লোক নয়, যে জানে, সেই-ই জানে। তবুও জেনে-শুনে কেন চন্দনী আগুন নিয়ে খেলতে গেল? যদি খেললই তা আমাকে এতদিন পরে তার সঙ্গে জড়ালো কেন?

এও মনে পড়ল, মেয়েটি আমাকে ভাই পাতিয়েছিল। ওর বিয়ের সময় আমি ছিলাম। তেমন কোনো বিপদে না পড়লে সে আমার কোলকাতার ঠিকানা জোগাড় করে অন্যকে দিয়ে চিঠি লেখাত না।

কিন্তু টিকড়পাড়া যেতে হলে তো দিন পনেরোর ছুটি না হলে নয়। ছুটি পাওনা আছে বটে, কিন্তু ছুটির দরকারও কম নয়। সেজদি-জামাইবাবু জব্বলপুরে বদলী হয়ে যাওয়ার পর থেকে দু' বছর হলো লিখছে যাওয়ার জন্যে। জামাইবাবুর একটা মাইল্ড অ্যাটাক হয়ে গেছে। যাওয়া কর্তব্য। মাকে নিয়ে একবার দক্ষিণ ভারত দেখিয়ে আনার কথা বহুদিন থেকে ভাবছি। এর মধ্যে চন্দনীর ভূমিকা কি? সে আমার কে?

বিরক্ত হয়ে পোস্টকার্ডটা ছিঁড়ে ফেললাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রোজই ঘণ্টা দুয়েক কিছু পড়ি বা লিখি। পড়া-লেখা কিছুই হলো না। মনটা কেবলই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ছিঁড়ে-ফেলা পোস্টকার্ডটার টুকরোগুলোর মতো পাখার হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

আস্তে আস্তে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল চন্দনী ও চন্দ্রকান্তকে নতুন করে। চন্দনীর কালো চিকণ সমর্পণী চোখ দুটি মনের চোখে চক্‌চক্‌ করে উঠল।

হঠাৎ নিজেকে বললাম, এ-জীবনে ক'টা কর্তব্যইবা তুমি করেছ? মা-বাবার প্রতি, ভাই-বোনের প্রতি? বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি? আর যাকেই মানাক তোমাকে কর্তব্যর দোহাই মানায় না; মেয়েটি নিশ্চয়ই বড় বিপদে পড়েছে। নইলে এমন করে ডাকে না কেউ কাউকে।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে ঠিক করলাম, কাল সকালে গিয়েই বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ছুটির দরখাস্ত করব।

পরদিন ছুটি পেয়েও গেলাম আশাতীতভাবে। আমার ছোট অফিসের বড় সাহেব বললেন, পনেরো দিন কেন, তুমি কুড়িদিনই নাওনা কেন? পরে বরং আর ছুটি পাবে না। তোমাকে বোম্বে পাঠাব তিনমাসের জন্যে। ফিরে এলেই।

বড় সাহেবের ছোট ছেলে স্টেটস্-এর হুষ্টনে খুব ভালো চাকরী পেয়েছে। ছেলেটিও ব্রিলিয়ান্ট্। খবর এসেছে গতকাল। সাহেবের আজ মেজাজ শরীফ্। আমার কপাল। চন্দনীরও।

ছুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌমেনবাবুকে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করে দিলাম। আগামী রবিবার পুরী এক্সপ্রেসে ভুবনেশ্বর পৌঁছব তারপর ওদের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে যাব। আমাকে একটা জীপ দিতে হবে দিন পনেরোর জন্যে। একটু পর ট্রাঙ্ক-অপারেটর জানাল, লাইন আউট অফ অর্ডার। তাই ফোনোগ্রামই করে দিলাম।

॥ ২ ॥

সৌমেনবাবুরা এবার জুকুব্ ক্যাপে ক্যাম্প করেছেন। সেখানেই কাঠ কাটা হচ্ছে। টুল্বকার কাছে ভীম্ধারার পুরোনো ক্যাম্পটাও আছে। কিন্তু এবার কি আর ক্যাম্পে থেকে জঙ্গল দেখার সৌভাগ্য হবে আমার? চন্দনীর বিপদটা কি কে জানে?

সৌমেনবাবু দুপুরে খাওয়ার সময় বললেন; উনি কোনো খবরই জানেন না চন্দনীর এবং একটু অভিমানমিশ্রিত বিরক্তিও দেখালেন। কটকে এত লোক থাকতে, ভুবনেশ্বরে সৌমেনবাবু নিজে থাকতে তবু চন্দনী হঠাৎ কোলকাতা থেকে আমাকে তলব করেছে বলে।

তারপর হেসে বললেন, যারা ঝুটঝামেলা ভালোবাসে ঝামেলা-ঝক্কি তাদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। বুঝলেন।

আমি হেসে বললাম, যা বলেছেন।

সবজীমণ্ডীতে গিয়ে কিছু কাঁচা বাজার করে নিয়েছিলাম। চাল, ডাল, তেল ঘিও। কোথায় থাকব, কি খাব কিছু ঠিক নেই। তাঁবু থাকলে ভালো হতো। ত্রিপল চেয়ে নিলাম একটা। আমার পয়সা থাকলে পুরোনো স্টেশন-ওয়াগন কিনে ডিজেল এঞ্জিন বসিয়ে ক্যারাভান বানিয়ে নিতাম একটা। যে-কোনো জঙ্গলে যেখানে সেখানে যখন ইচ্ছে থাকা যেত তাহলে।

এ জীবনে অনেক সাধই অপূর্ণ রইল, তার মধ্যে এও একটা। বড় সাধ।

হিন্দোলের পর ঢেন্‌কানল্ পেরোলাম। গরম এখনও তেমন পড়েনি। সামনেই দোল। ঢেন্‌কানলে এক কাপ চা আর পোড়পিঠা খেয়ে শেষ বিকেলে অংগুলে এসে পৌঁছলাম। অংগুল থেকে টিকড়পাড়া যাব। কর্‌তপটা-পূর্ণাগড়-পম্পাশর-পূর্ণাকোট হয়ে। গহন জঙ্গল পথের দুপাশে। অন্য জানোয়ারের ভয় করি না। পথে হাতী পড়লে মুশকিল করতে পারে।

পূর্ণাকোটে যখন এসে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার ঘন। এখানে আরেককাপ চা খেয়ে টিকড়পাড়ার দিকে চললাম। টিকড়পাড়ার ঘাটে গিয়ে জীপ থামালাম প্রায় দেড়শ মাইল এসে। জীপটা একটা দোকানের সামনে পার্ক করিয়ে, দোকানীকে জীপ দেখতে বলে, ঘাটের মুখে শেষ যে দোকান সেখানে গিয়ে শুধোলাম ওড়িয়াতে, চন্দনী বলে কোনো মেয়ের খোঁজ জানো ? টিকড়পাড়ায় থাকে ?

এই দোকানদারদের অনেকেই আমাকে চেনে। বৌধ ও ফুলবানী যাতায়াতের পথে অথবা জঙ্গল থেকে এসে অনেক সময় আমরা টিকড়পাড়ার ঘাট থেকে মাছ কিনে এইসব দোকানে ভেজে নিয়ে খেতাম। এখানকার মহানদীর সাতকোশীয়া গণ্ডের মাছের স্বাদই আলাদা।

দোকানী অবাক হয়ে বলল, কে চন্দনী ?

আমি চন্দনী চন্দ্রকান্ত দুজনের কথাই বললাম।

লোকটা চিনল বলে মনে হলো না।

তারপর বলল, আপনি বসুন, আমি খোঁজ করছি।

আমি ওর দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চে বসে পাইপটা ধরালাম।

সামনে মহানদীর সাতকোশীয়া গণ্ড। আবছা চাঁদের আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। শীতলপানির উল্টোদিকে বাঁক নিয়েছে নদীটা। ওপারে পদ্মতলা, শীতলপানি, মাথা উঁচু ঘন অরণ্যানী-বেষ্টিত পাহাড়। বন, পাহাড়, এই নদী, নদীর পাড়ে বেঁধে রাখা ছোট-ছোট জেলে নৌকো, হিলজার্স কোম্পানীর মোটর-বোটটা, সবই যেন চাঁদনী রাতে কেমন মোহময় অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে।

খুব জোরে নিশ্বাস নিলাম আমি। ফুসফুস সাফ হয়ে গেল। অনেক—অনেকদিন পর আমি আমার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রেমিকার কাছে এসেছি—এই বন, পাহাড়, নদী, এই জঙ্গলের গন্ধ, খোলা বাতাসের এলোমেলো চুলের স্বস্তি: সব, সব। কী ভালো যে লাগে তা কি বলব। কোলকাতার খাঁচায় বন্দী একটা দু পেয়ে জানোয়ার বহুদিন পর আবার চার পেয়েদের রাজ্যে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

অনেকক্ষণ পর দোকানী ফিরে এল, সঙ্গে মোটাসোটা একজন হস্তিনী মেয়ে।

দোকানী গম্ভীর মুখে বলল, মাউসী। অর্থাৎ মাসী খবর জানে।

মাউসী পাকা ব্যবসাদারের মতো মুখ করে শুধোল, আমি কি চাই; কোন বয়সের মেয়ে চাই?

থতমত খেয়ে দোকানীর দিকে চাইলাম আমি।

দোকানী আমার চাউনী আমাকে ফেরৎ দিয়ে, মাউসীকে বলল, চন্দনী। বাবু চন্দনীকেই চায়।

মাউসী তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, চন্দনীর ঘরে লোক আছে। তোমাকে একটু দাঁড়াতে হবে।

তারপর আবার জীপগাড়ি ও আমার ভদ্র পোষাক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে বলল, সারারাত থাকবে?

কি বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, হুঁ।

—তবে দশ টাকা লাগবে। আর আমার পাঁচ টাকা। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল মাসী।

বললাম, ঠিক আছে।

দোকানী আমার চোখের দিকে চেয়ে বুঝল কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

তারপর বলল, চা বানাই?

বললাম, বানাও।

মাউসী অগ্রিম পনেরো টাকা নিয়ে চলে গেল।

বলল, ঘর খালি হলে তোমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যাব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। এই ঘাটে বহুবার এসেছি, গেছি। থেমেছি। এক-দুবার খিচুড়ি রাঁধিয়েও খেয়েছি। কিন্তু কখনও জানিনি যে, প্রকৃতির এই আশ্চর্য উদার প্রসন্নতার নীচে পৃথিবীর আদিমতম অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে। বিড়িগড়ের চন্দনীকে এইভাবে আবিষ্কার করব বলে দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। এখন বুঝলাম যে, কেন ও স্থানীয় মুরুব্বীদের কাছে সাহায্য চায়নি। ও হয়ত যে কারণেই হোক আমাকেই ওর সবচেয়ে আপনজন ভেবেছিল। এটা সৌভাগ্য ভেবেছিলাম। এখন দেখছি দুর্ভাগ্য।

দোকানী মুখ নীচু করে চা বানাচ্ছিল।

আমি বললাম, চিনি কম দিও।

ও স্বগতোক্তির মতো বলল, ঘাসিয়ানী মেয়েদের কেউ কেউ এরকম; সবাই নয়। আপনি অবাক হলেন বাবু? এ তো গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে। তারপর বলল, ভাগ্যিস চলছে, নইলে আমরা তো না খেয়ে মরতাম। ওদের জন্যেই অনেকখানি কেনা-বেচা, বাবুদের আসা যাওয়া।

কেউ, কেউ? ঘাসিয়ানী মেয়েরা! আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

অল্প বয়সী চিকণ মেয়েগুলো। চক্‌চকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা। তেল দিয়ে পাটি করে চুল আঁচড়ায়, মাথায় লাল-নীল-হলুদ ফুলের

মতো রিবন বাঁধে, বড় বড় পেতলের ঘড়া কোমরে বসিয়ে মহানদী থেকে জল আনে, চান করে সেখানে। কখনও সখনও নৌকোয় জীপ বসিয়ে নদী পেরোবার সময় হঠাৎ তাদের কারো কারো অনাবৃত সুডৌল বুকে চোখ পড়ে ভালো লাগায় এবং লজ্জাতেও চমকে উঠেছি। ওদের সুন্দর শরীর ওদের অবসরের ধীর জীবন, ওদের চটুল সরল তারল্য এ সব কিছুকেই ঐ দারুণ পটভূমির এক অঙ্গাঙ্গী টুকরো বলে মেনে নিয়েই ভালো লাগায় বিবশ হয়েছি।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কেন যে মানুষ ফুল দেখেই খুশী থাকে না, দু' হাতে ফুলের পাঁপড়ি ছেঁড়ে, পদ্ম বনে হাতীর মতো ঢুকে পড়ে সুন্দরকে অসুন্দর করে, সারল্যকে কদর্য করে! সবচেয়ে লজ্জা লাগে এ কথা ভাবলে যে, যারা তা করে তারা আমাদেরই মতো অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও শহুরে মানুষ। এত বছর পরে, আজ হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, এই অর্দ্ধনগ্ন গামছা পরা দোকানদাররা, এই অশিক্ষিত ঘাসিয়ানী ছোট ছোট মেয়েগুলো, আমাদের মতো গাড়ি-চড়া, ইংরিজী-বলা বাবুদের কী চোখে দেখে, কী ভেবে হাসে ওরা। .কী ভেবে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে!

দোকানী চা টা এগিয়ে দিল।

মুখ নীচু করে চা খেতে খেতে বড় আপনমনে, গ্লানিতে আমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে মাউসী এলো। পিছনে পিছনে ছায়ার মতো খাকি হাফ-প্যান্ট আর খাকি হাফ-শার্ট পরা একজন মাঝবয়সী লোক। এই-ই তাহলে এতক্ষণ চন্দনীর ঘরে ছিল? লোকটা কাছাকাছি কোনো জঙ্গলের ফরেস্ট গার্ড হবে হয়তো অথবা কোনো কাঠের বা বাঁশের ঠিকাদারের মুহুরী-টুহুরী! লোকটা ঘাটের দিকে নেমে গেল কোনোদিকে না চেয়ে।

চন্দনীর উপর আমার খুব রাগ হতে লাগল। তার চেয়েও বেশী চন্দ্রকান্তর উপর। বিড়িগড়ের মুক্ত উদার নির্মল আবহাওয়া থেকে চন্দ্রকান্ত চন্দনীকে এ কোথায় নামিয়ে আনল? চন্দনীর

অপরাধ কি? এটাই কি একমাত্র অপরাধ যে, চন্দ্রকান্তকে ও ওর সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছিল?

পরক্ষণেই আবার মনে হলো, বলরাম কি এই মেয়ের জন্যই পাগল হয়ে গেছিল। এইরকম একজন পণ্যার জন্যেই কি সে গুণ্ডা হাতীর পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ হারাল?

কেন জানি না, সমস্ত মেয়ে জাতটার উপর আমার বড় ঘেন্না জন্মে গেছে। কী শহরে কী জঙ্গলে এরা পারে না এমন জিনিস নেই। ওদের স্বার্থপরতার, ওদের সুখের লোভের, ওদের নির্লজ্জ সাধের শেষ নেই কোনো। বড় ইতর; বড় ইতর এরা। যে ভালোবাসে, তাকে এরা পায়ে মাড়ায়, পায়ে মাড়িয়ে এদের সুনামের জন্যে অথবা দুর্নামের ভয় এড়ানোর জন্যে, শরীরের সুখের জন্যে, গয়নার জন্যে ভালো খাওয়া পরার জন্যে এরা যাকে-তাকে জড়িয়ে ধরে; যার তার কাছে তার যা পরম ধন তা বিকোয়।

কিন্তু কেন? শরীরের কোনো নিভৃত কেন্দ্র বিন্দুই কি তাদের পরম ধন? তাদের মন বলে কি কোনো পদার্থই নেই, কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ, প্রেমের বোধ কিছুই কি নেই? দুটি সুন্দর পায়ের মধুর মধ্যস্থলেই কি এদের সমস্ত বাঙময় ব্যক্তিত্ব নিভৃত নম্রতায় স্থির হয়ে থাকে? লজ্জা; লজ্জা; এ বড় লজ্জার।

যেখানে জীপ রেখেছিলাম, সেই দোকানীকে দুটো টাকা দিয়ে রাতে জীপটাকে দেখতে বললাম।

ও বলল, গরমের দিন। ওর এক ছেলেকে গাড়িতে শুয়ে থাকতে বলবে সারারাত, কিছু চুরি যাওয়ার ভয় নেই।

ও কি জানবে? যা চুরি হওয়ার তা চুরি হয়ে গেছে এই রাতেই। বুকের মধ্যে দারুণ এক গর্বময় স্নিগ্ধ সরলতার বোধই চুরি হয়ে গেছে। কোন পাহারাদার সেই চুরি রুখবে?

গলিটা সরু। এদিকে ওদিকে মাটির দেওয়ালের খড়ের ঘর। বাঁশের কঞ্চির বা ফালি বাঁশের বেড়া তোলা। বেড়ায় বেড়ায় নানান লতা লতিয়ে আছে। কোনো ঘরে কেরোসিনের কুপী

জ্বলছে। বাচ্চার গলা শোনা যাচ্ছে। কুকুরের ভুক্-ভুক্। শুয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, বিড়ালের মিঁউ-মিঁউ।

মাউসীর পিছনে চলেছি তো চলেইছি। বস্তীর প্রায় শেষে এসে মাউসী থামল। বেড়ার মধ্যের দরজা দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল। উঠোনে একটা সজনে গাছ, তুলসী মঞ্চ। একটা কালো রোগা কুকুর সামনের হু পায়ের উপরে মাথা রেখে শুয়েছিল। আমাকে দেখে একবার চোখ খুলল, অস্ফুটে একটা আওয়াজ করল, তারপর আবার চোখ বুঁজে ফেলল। বুঝি ঘেন্নায় আমার দিকে তাকাল না।

মাউসী দরজা দেখিয়ে ফিরে গেল। বলল, দরজা খুলো না, সারারাত। কতরকম লোক আসে যায়।

সারারাত তাহলে এই ঘাটে নানান সরীসৃপের আসা-যাওয়া? কত কী-ই জানিনি এতদিন?

দরজা ঠেলে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে। তখন ওঘরে কেউ ছিল না।

ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের মাচা—তার ওপর শতছিন্ন তোষক। উপরে একটা কুঁচকানো নীল রঙা কট্‌কী বেডকভার। তাল-গোল পাকানো তেলচিটে বালিশ একটা। কত লোক যুদ্ধ করে এর উপর কে জানে? ঘেন্নায় আমার গা রি-রি করতে লাগল। ঘরের কোণায় কটক-চণ্ডীর পট। সিঁহুর লেপা। বলরাম ও জগন্নাথের পটও আছে। চারপাশেই মাটির দেওয়ালে বনের কাঁটায় লটকানো অভব্য ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো প্রায় বিবসনা একটি মেয়ের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। হু ঘরের মাঝের চৌকাঠে কুপী জ্বলছে কেরোসিনের।

ভিতর থেকে চন্দনী ওড়িয়াতে বলল, বসো বাবু, আসছি এক্ষুনি। লক্ষ্মীটি বোস।

গলার স্বর এখনো মৌটুসী পাখির মতোই মিষ্টি আছে, কিন্তু মনে হলো সেই সারল্য নেই স্বরে। বেসাতির স্থূল ঘর্ষণে ঘর্ষণে পসারিনীর ধূর্ততা লেগেছে গলায়। হায়! চন্দনী!

একেই কি দেখেছিলাম বিড়িগড়ের হুর্গ থেকে নেমে আসার

সময়? একেই কি অনবধানে মনের গোপন কোণে ভালোবেসে-ছিলাম? চন্দ্রকান্তর বিয়েতে আমি কি সত্যিই খুশী হয়েছিলাম? সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে, সেই হতবাক্-আমাকে শুধোলাম আমি। চন্দনী কি আমার কাছে শুধুমাত্র একটি জংলী মেয়েই? তাই-ই যদি হবে, তাহলে কোলকাতা থেকে এতদূরে অন্যের হাতে লেখানো চিঠি পেয়ে কেন এত কষ্ট করে, নিবিড় গভীর বনের ধূলি-ধূসরিত বিপদসংকুল পথ ঠেলে এত দূরে এলাম? চন্দনীকে এই পরিবেশে আবিষ্কার করার জন্যেই কি?

যাকে পনেরো টাকায় এক রাতের জন্যে পাওয়া যায়, তাকে সারাজীবনের জন্যে পাওয়ার দাম কত? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? ব্যস্‌স্‌?

চন্দনী, তুমি এতই সস্তা! সব মেয়েই কি এত সস্তা? তাই-ই বোধহয়। নইলে 'পারিধীর' বলরামরা কেন মরে গিয়েও বেঁচে যায়! কেন তারা তোমাদের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েও অমর হয়?

ঘেন্না, ঘেন্না, থুথু ফেলতে ইচ্ছা করল আমার।

চন্দনী আমকে চিনতে পারল না। ঘরে এসে সেই খাটে বসল। দেখতে আরো সুন্দরী হয়েছে ও। কোমরের কাছটা একটু ভারী হয়েছে। মুখটা ভরেছে। কুমারীর কুমারীত্ব ঘুচলে কুমারী-সৌন্দর্য ছাপিয়ে যে এক ঢল নামে সেই ঢল নেমেছে ওর সারা অঙ্গে। চেহারায় গভীরতা এসেছে, মনে না আসলেও।

চন্দনী প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি। কেন চিনতে পারেনি তা ওই-ই জানে। হয়তো আমি সত্যিই আসব একথা ও বিশ্বাস করেনি। হয়তো আমারও চেহারার পরিবর্তন হয়েছে এই তিন বছরে।

ও হাত ধরে আমাকে যখন ওর খাটে বসাতে যাবে, তখুনি ও হঠাৎ আমায় চিনতে পারল। চিনতে পেরেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিড়িগড়ে কখনও সে জামা বা শায়া পরেনি। এখানে জামা, শায়া সব পরেছিল। কিন্তু স্তন-সন্ধির অনেকখানি যাতে দেখা যায়, যাতে নারী মাংস লোভীরা আকৃষ্ট হয় ওর নরম উজ্জ্বল কালো

সৌন্দর্যে তাই জামার অনেকখানি উৎসাহে উন্মুক্ত।

আমাকে চিনতে পেরে চন্দনী বুকে আঁচল টেনে দিয়েছিল। তারপর এমসময় দরজার কাছে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওর দু চোখের পাতা বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি খাটের এক কোণায় বসে পড়ে পাইপ খোঁচাবার ভান করে মুখ নীচু করে রইলাম।

কাঁদুক। অনেক না কাঁদলে ও সত্য-মিথ্যা কিছুই আমাকে বলতে পারবে না। ওর কি বলার আছে আমাকে শুনতে হবে। সেই কারণেই এতদূরে আসা।

কিছুক্ষণ পর ও একবার ফুঁপিয়ে উঠেই নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল।

আমি আস্তে ডাকলাম, চন্দনী!

ও সাড়া দিল না।

আবার বললাম, কথা বলবে না তুমি? তাহলে এতদূর থেকে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন? তোমার জন্যে কি করতে পারি, বলবে না?

চন্দনীর খুব কষ্ট হতে লাগল। যন্ত্রণায় ও মাথাটা এদিক ওদিক করতে লাগল। চোখের জলে ওর গাল, বুকের জামা, শাড়ির আঁচল সব ভিজে যেতে লাগল।

আমি উঠে গিয়ে ওকে হাতে ধরে নিয়ে এসে খাটে বসালাম।

কী যেন হয়ে গেল আমার। যা আগের মুহূর্তেও করব বলে ভাবিনি, তাই-ই করলাম। থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকা চন্দনীকে ডান হাতে জড়িয়ে আমার বুকের কাছে নিয়ে এলাম। ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ আগে যে ঘরকে, হে মানুষকে ঘৃণা ছাড়া দেওয়ার মতো কিছু আমার ছিল না, তাকে এই মুহূর্তে সমবেদনা জানালাম

আমি।

আমাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে কত বিভিন্নমুখী মানুষ থাকে আমরা কি জানি? কোন মানুষটা এসে যে আমাদের উপর দখল নেয়, তা আগে থেকে কেউই বলতে পারি না। এই মুহূর্তের আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগের মানুষটার কোনোই মিল নেই। আমি ইতি-মধ্যেই চন্দনীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ওর জবাবদিহি না শুনেই।

চন্দনী প্রথম কথা বলল: আমার কাছে অংগুল থেকে এক বাবু এসেছিল। তাকে তোমার ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি লিখতে বলেছিলাম। সেও লিখবে বলে ভাবিনি, লিখলেও সে চিঠি তুমি পাবে বলে জানিনি; পেলেও তুমি যে আমার চিঠি পেয়ে সত্যিই একদূরে আসবে একথা বিশ্বাসও করতে পারিনি।

আমি চুপ করে রইলাম।

ও বলল, ক্ষিদে পেয়েছে? তুমি কি কিছু খাবে?

আমি বললাম, পরে।

তারপর বললাম, তোমার কথা বলো। চন্দ্রকান্ত কোথায়?

চন্দনীর মুখে ঘৃণা ফুটে উঠল।

বলল, ও একটা মানুষ নয়। ওর জন্যেই আমার এই অবস্থা। কি কষ্ট যে করেছি কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্যে গত তু মাস, তা আমিই জানি। হাঁপানীর রুগী—মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন অসুস্থ থেকেছে, আর অর্দ্ধেক দিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা আকাট পাষণ্ড। বলেই, চন্দনী ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

বাইরে থেকে একটা কর্কশ পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, তোকে মার-ধোর করছে নাকি?

চন্দনী তাড়াতাড়ি বলল, না, না। আমার স্বামীর কথা বলছি।

লোকটা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, স্বামী ঘণ্টায় একটা করে পাবি, গাড়ি চড়ে আসা শাঁসালো খদ্দের বিগড়ে গেলে সব গেল।

লোকটা ভেবেছিল, আমি ওড়িয়া বুঝি না বা ওড়িয়াতে কথা বলতে পারি না।

চন্দনা বলল, ঠিক আছে, তুমি যাও।

আমি বললাম, বলো, বলে ওর গা থেকে হাত নামিয়ে নিলাম।

চন্দনী নিজে আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতে ধরে নিজের কোলে রাখল। বিছানায় উঠে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আসন করে বসল। আমাকে সামনে বসাল। বলল, চন্দ্রকান্ত একটা জোচ্চোর, খুনী। তুমি আমাকে এখানে ফেলে যেও না। আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলো। তোমার ঝি হয়ে থাকব আমি। তাও ভালো। তবু তুমি আমাকে বাঁচাও।

আমি বললাম, বলো, যা বলছিলে।

চন্দনী লজ্জা পেল। তারপর বলল, ও একটা হাতী মেরেছে টুম্বকায় চুরি করে। ফরেস্ট অফিসের লোকরা, পুলিশের লোকরা সব ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চারদিকে। হিলজার্স্ কোম্পানির বাংলোতে অনেক সাহেবরা এসে আছেন। এখন পাখি মারা পর্যন্ত বন্ধ। আর ও হাতী মেরে দিল।

আমি বললাম, উনি তো বরাবরই এরকম। আইন মানা তো ওঁর রক্তে নেই। কিন্তু হাতী মারলো কেন? দাঁত কি খুব বড় ছিল? অনেক টাকা পেয়েছিলো?

চন্দনী হাসল। তখনও ওর চোখ ভিজে ছিল। ওর হাসিটা বড় মিষ্টি দেখাল।

বলল, তাহলেও তো বুঝতাম! লোকে গরীব হলে, কষ্টে পড়লে অনেক কিছু খারাপ কাজ করে ফেলে পেটের দায়ে। বউকে, প্রেমিকাকে খুশী রাখবার জন্যে, তাদের শাড়ি গয়না দেওয়ার জন্যেও অনেকে চুরি ডাকাতি করে, তারও একটা মানে বুঝি। ওসব কিছু না। ঐ হাতীটা নাকি ওকে অপমান করেছিল। ওর মধ্যে নাকি ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ও নাকি বুকের মধ্যে ভয় নিয়ে বাঁচতে চায়নি কখনও। আচ্ছা এমন কে আছে যার ভয় নিয়ে বেঁচে না থাকতে হয়? তুমি যে শহরে চাকরী করো তোমার যে মালিক তাকে তুমি ভয় করো না? আমি চন্দ্রকান্তকে ভয় করিনি? কোনো-না-

কোনো ভয় বুকে নিয়ে সকলকেই যে বাঁচতে হয় একথা কখনও মানলো না গোঁয়ার লোকটা। পায়ে হেঁটে-হেঁটে গত বর্ষায় হাতীটাকে মেরেছিল ও। হাতী মেরে লুকোনো যায় না। হৈ হৈ পড়ে গেল চারদিকে। দিল্লী থেকে কোলকাতা থেকে ওয়াইল্ড-লাইফ না কি বলে তার সব বড়কর্তারা এলো। জঙ্গলে ছুঁচ খোঁজার মতো করে ওকে খুঁজলো। কিন্তু পেল না। এদিকে হাতী মারল ও, আর সেই হাতীর দাঁত পা কেটে নিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকে। যখন ধরা পড়ল, তখন বলল, চন্দ্রকান্ত বলেছিল কেটে নিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে ওগুলো। তারা ছাড়া পেল ঠিকই, কিন্তু তাদের অপরাধটা পড়ল ওর ঘাড়ে। ওর নির্ঘাৎ জেল হবে ধরা পড়লে। আর জেল না হলে সারাজীবন জঙ্গলে জঙ্গলে জংলী জানোয়ারের মতো ঘুরে বেড়াবে।

তারপর বলল, মরুক ও। মরলে বাঁচি। কাকে ভুল করে ভালোবেসেছিলাম ভাই? এমন ভুল কেউ কি করে?

আমি চুপ করে রইলাম।

আমি বললাম, তুমি তো জানতে। চন্দ্রকান্ত তো তোমাকে বলেছিলেন যে, ঘর বাঁধার লোক তিনি নন। তবু তুমি জেদ করে বিয়ে করতে গেলে কেন তাঁকে। পারলে কি ধরে রাখতে? এই তো হাল হলো তোমার?

—পারলাম না, পারলাম না। বলে চন্দনী মাথা নাড়ল।

চন্দনীর হার স্বীকার ও হার স্বীকারের করুণ ভঙ্গী দেখে আমার বড় দুঃখ হলো।

চন্দনী বলল, কিন্তু আর যে কাউকে ভালোবাসতেও পারলাম না। এমন কি ভালো লাগাতেও পারলাম না। এক তোমাকে ছাড়া।

আমি চমকে উঠলাম!

বললাম, আমি কে? আমি তোমার কেউ না।

চন্দনী মলিন হাসি হাসল। বলল, তা তো বটেই। নইলে কেউ

কি আর পরের লেখা চিঠি পেয়ে চারদিনের মধ্যে সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এই নরকে এসে পৌঁছয় ?

একটু থেমে চন্দনী বলল, জানো, আমাদের শরীরের দাম পুরুষদের কাছে অনেক, এ ক'দিনে বড় ঘৃণার সঙ্গে তা জেনেছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছে কিছুমাত্র নয়। গত দু মাসে কত পুরুষ এই শরীরটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলল, কিন্তু মনটাকে ছুঁতে পারল না একজনও। ভারী অবাক লাগে ভাবলে। শরীরের নোংরা তো মহানদীতে চান করলেই ধুয়ে যায়, মনের ময়লা যে ধোয়া যায় না কিছুতেই।

তারপর বলল, চন্দ্রকান্তকে আমি কী-ই না দিয়েছি। কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করি। যে পুরুষ মেয়েদের ভালোবাসার মর্যাদা দেয় না, সে পুরুষ নয়। চন্দ্রকান্তও একটা জানোয়ার। বন জঙ্গলেই ও ফেরারী হয়ে থাকুক আজীবন। ওর মুখ দেখতে চাই না আমি।

আমি বললাম, আমার মনে হয় হাতীদের সঙ্গে চন্দ্রকান্তর একটা গভীর ঝগড়া ছিল। এটা ঠিক সাধারণ ঝগড়া নয়। হাতীটাকে না মারলে তিনি বোধহয় নিজের কাছে হেরে যেতেন। নিজের কাছে হেরে যাওয়ার, হেরে থাকার লোক চন্দ্রকান্ত নয়। এই হার-জিৎ ওঁর কাছে বাঁচা-মরার চেয়েও বড়। তুমি হয়ত বুঝবে না। বললেও বুঝবে না।

তারপর বললাম, তোমার মনে নেই বিড়িগড়ের হাতীদের কথা ? আমার মনে আছে। যেদিন আমাদের ক্যাম্পের পাশের কুয়ো-তলায় হাতীগুলো এলো, যেদিন পারিধীতে-যাওয়া সেই ছেলেটিকে পায়ের তলায় ফেলে দিল হাতী, যেদিন বলরামকে মারল, সেইসব দিনের কথা মনে আছে আমার। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই রাতে হাতীগুলোর পায়ের নখে ছর্‌রা মেরে যখন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি, তখন চন্দ্রকান্ত আমাকে বলেছিলেন, "আপনি বুঝবেন না এদের অসহায়তা। অসহায়, দুর্বল, নিরস্ত্র এইসব লোকগুলোর এত বড় পাহাড়ের মতো সবল ও বদমাইস হাতীর সামনে পড়ে নিরুপায়-

ভাবে অসহায় প্রতিদিন মার খাওয়া যে কি অসম্মান ও লজ্জার তা আপনি, আপনার মতো শহুরে শিকারীরা হয়তো বুঝবেন না।”

চন্দনী বলল, তুমি যাই-ই বল, লোকটা বড় স্বার্থপর। জীবনে নিজেরটাই বুঝল। নিজের জেদ, নিজের খুশী, নিজের স্বাধীনতা, তার জন্যে অন্যের যে কি দাম দিতে হলো তা একবারও বুঝল না। এমনই যদি হবে, তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন?

আমি বললাম, একথা বলা তোমার অন্যায় চন্দনী। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, যেদিন তুমি আমি আর চন্দ্রকান্ত বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, যেদিন সন্ধ্যার পর ঘাসের বনে গিয়ে তোমাকে আদর করলেন চন্দ্রকান্ত চাঁদের রাতে, সেদিন আমার সামনেই উনি তোমাকে বলেছিলেন, “তুই এত বোকা কেন রে চন্দনী? তুই ঘর বাড়ি, গরু-বাছুর নিশ্চিন্তি সব ছেড়ে আমার মতো পথের লোককে বিয়ে করছিস কেন? তোকে আমি একটা ঘর পর্যন্ত দিতে পারবো না। যা তুই নিকিয়ে, পরিষ্কার করে, তোর মনের মতো করে সাজিয়ে রাখবি। নিজের ঘরে নইলে, নিজের স্বামীর ঘরে নইলে, কোনো মেয়েকে কি মানায়? বল্?”

চন্দনী বলল, হ্যাঁ। মনে আছে। কিন্তু আমি এ-কথার জবাবে কি বলেছিলাম? বলেছিলাম যে, তুমি আমার পাশে পাশে থেকো। আমাকে ছেড়ে যেওনা কখনো। তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাইবো না।

তারপর বলল, বল, বলেছিলাম কি না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, বলেছিলে।

চন্দনী হঠাৎ বলল, এবার তুমি কিছু খাও। আমার ঘরে কী-ই বা আছে। যা রেঁধেছিলাম বিকেলে তাই-ই খাও।

খাট থেকে নেমে যাবার সময় হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এই ঘরে আমার হাতে খাবে তো তুমি?

ভারী সুন্দর দেখাল চন্দনীকে, যদিও ওকে আমি সবসময়েই সুন্দর দেখছি। ওর হাঁটা, ওর কথা বলা, ওর চোখের চাউনি।

আমি হাসলাম, তারপর ঠাট্টা করে বললাম, না খাবো না।

—না খাওয়াই উচিত তোমার। চন্দনীও হেসে বলল।

তারপর পাশের ঘরে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, দশ বছর বয়স থেকে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত-কত জঙ্গল দেখলাম, কত শিকারী দেখলাম, রাজা-মহারাজা, গরীব-গুর্‌বা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিন্তু চন্দ্রকান্তর মতো আশ্চর্য একটা চরিত্র দেখলাম না কখনও। এমন নিষ্ঠুরতা এবং এমন দয়াও দেখলাম না কারো মধ্যে। এমন শিক্ষা ও অশিক্ষাও। চন্দ্রকান্ত আমার জীবনে এক দুর্মর অভিজ্ঞতা। বনে-জঙ্গলে আমার ঘুরে বেড়ানো সার্থক। চন্দ্রকান্তর মতো একটি চরিত্র খুঁজে পেয়েছি এ জীবনে, এইই তো যথেষ্ট।

মহানদী থেকে হাওয়া আসছে হু হু করে। চন্দনীর উঠোনের সজনে গাছের পাতায় ঝির্‌ঝির্‌ শব্দ উঠছে। আশে-পাশে কারো উঠোনে চাঁপা গাছ আছে। তার গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। কেরোসিনের কুপীটা নিয়ে গেছে চন্দনী ওঘরে। এ ঘর অন্ধকার। প্রথমে অন্ধকার লাগছিল। এখন চোখে সয়ে গেছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আবছা আলো এসে মাটির মেঝেতে পড়েছে। বেড়ার গায়ে তক্ষক ডাকছে ঠক্‌ ঠক্‌ করে। ঘরের ঠিক পিছনেই ইঁদুর তাড়া করেছে সাপ, কি সাপ কে জানে? দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে ইঁদুরগুলো। ঘরের মধ্যে ছুঁচো আছে। খড়ের চালের উপরে দৌড়াদৌড়ি করছে তারাও। ঘরের বাইরের ভয়ে। মাঝে মাঝে ডাকছে, চিঁক্‌-চিঁক্‌ করে।

চন্দনী ওঘর থেকে ডাকল। বলল, এসো।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। আসার পর থেকে একবার-দুবার ভাই বলেছিল চন্দনী। তারপর আমাকে আর কোনো সম্বোধনই করছে না। ও কি আবারও ভুল করতে চায়? এক ভুলেই তো জীবনের বাকি নেই কিছু। তাছাড়া চন্দনী জানে না যে, আমি গুণে না হলেও দোষে চন্দ্রকান্তই। ঘরে আমার আসক্তি নেই, কখনও ছিল না। বিশ্বাস নেই সমাজে, সংসারে। মাঝে-মাঝে যে বড় একা লাগে না, তা নয়। যৌবনের শরীর যে কাঁকড়ার মতো কামড়ায় না আমাকে এও সত্যি নয়। মনের মধ্যে বড় শীতও লাগে কখনও কখনও। কিন্তু তবুও সংসারের উপরে কোনো দাবীও রাখিনি আমি, সব অধিকারই আমার বিনা লড়াইতে ছেড়ে দিয়েছি। দায়িত্বও নিইনি তেমন, নেবোও না।

তফাৎ-এর মধ্যে এইটুকুই যে চন্দ্রকান্তর চারধারে কোনো খাঁচা নেই। কিন্তু আমার একটা খাঁচার প্রহসন আছে। কিন্তু সেই খাঁচাটা, ইঁদুরে-কাটা মশারীর মতো শতছিন্ন। তার ফাঁক দিয়ে দিয়ে যখন-তখন আমি গলে আসি। সমাজ-সংসার ভালোবাসার স্বরূপ আমি এই চর্মচোখে দেখেছি, এককালীন নরম হৃদয়ে তা অনুভব করেছি, তারপর নরম মাটিতে হাতীর পায়ের ওজনে যেমন গর্তর সৃষ্টি হয়, পরে সে গর্ত যেমন শুকিয়ে উঠে শক্ত লোহার মতো হয়ে যায়, সে জায়গা মানুষের চলার অযোগ্য হয়ে ওঠে যেমন, আমার হৃদয়ও তাই হয়ে গেছে। বিস্মৃতির নীল অপরাজিতা লতায় সেই শুকনো, কুদৃশ্য গর্তগুলো হয়ত ছেয়ে গেছে সময়ের ব্যবধানে, কিন্তু এই হৃদয়ে আর নম্রতা নেই। কাউকে আর ভালোবাসা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, নেই ভালোবাসা গ্রহণের ক্ষমতাও।

বেচারী চন্দনী! ও বড় সরল। এখনও সরল? শরীরটাকে নীলামে তুললেও কি মনটা বেঁচে থাকে? থাকে তো দেখছি। বড় আশ্চর্য মানুষের মন। এতে বড় সহজে ময়লা লাগে, আবার বড় নোংরামির মধ্যে থেকেও নোংরা লাগে না।

ঘরের এক কোণায় একটা মেঝে-খোঁড়া উনুন। কাঠ রাখা

আছে অন্য কোণায়। দেওয়ালে ঝোলানো আয়না। আয়নার সামনে দড়ি ঝোলানো এক টুকরো কাঠ। তার উপর প্রসাধনের সামগ্রী। এ দেওয়াল ও দেওয়ালের মাঝে নারকোল দড়ি দিয়ে ঝোলানো আল্না। তাতে চন্দনীর জামা-কাপড় ঝুলছে। লাল গোলাপ ফুল আঁকা একটি নীল টিনের ছোট্ট তোরঙ্গ। জলের কুঁজো, রান্না করার মাটির হাঁড়ি, এ্যালুমিনিয়মের গ্লাস। কলাই-করা সাদা থালা।

কাঁঠাল কাঠের একটা পিঁড়ি পেতে, মাটি নিকিয়ে চন্দনী আমাকে বসতে বলল।

শুধোলাম, তুমি খাবে না?

—তুমি খাও না। পরে খাবো। ও বলল।

মনে হলো, আদরের ধমক দিল আমায় চন্দনী। আমার মনে সজনে পাতার মতো দোলা লাগল। কাউকে ভালোবেসেই শুধু মেয়েরা এমন করে কথা বলতে পারে। আমার ভয় করতে লাগল।

মোটা চালের লাল ভাত। একটু লাউয়ের তরকারী। আর মাছের কাঁটা দিয়ে তেঁতুলের টক্।

ক্ষিদে পায়নি যে অমন নয়। কিন্তু ওতো একজনেরই রান্না করেছে। সেই ভয়ে ইচ্ছে করেই কম খাবো ঠিক করলাম।

চন্দনী কুপীর সামনে আসন-পিঁড়ি হয়ে আমার দিকে মুখ করে বসল। আমার খাওয়া দেখতে লাগল। কম্পমান কুপীর আলোটা ওর চিকন মুখের উপর নেচে যাচ্ছিল। ও বলল, লজ্জা করছে আমার। তোমরা কত কি ভালো খাও।

আমার কিন্তু বড় ভালো লাগছিল। কতদিন যে আমার খাওয়ার সামনে কেউ এমন করে বসেনি, পাতের দিকে চেয়ে দেখেনি কি লাগবে না লাগবে। বড় অভিমানি ছিলাম একদিন। সংসারে আজকে আমার মতো নিরভিমানী লোক নেই। কোনো পাওনা নেই কারো কাছে। পাওয়ার বাসনাও নেই। তাই হঠাৎ যা পাওয়ার নয় তা পেয়ে চোখে জল এসে যাওয়ার মতো হলো। কষ্টে সংযত

করলাম নিজেকে।

চন্দনী বলল, হাঁড়িতে কিন্তু ভাত অনেক আছে। তরকারীও আছে। তুমি কিন্তু আমার কথা ভেবে আধ-পেটা খেয়ে থেকো না। যদি সব ফুরিয়েও যায়, তাহলে আবার রেঁধে নেবো। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার শরীর-বেচা পয়সায় কেনা ভাত খেতে তোমার ঘেন্না হচ্ছে বুঝি?

আমি বললাম, আর একটু ভাত দাও।

চন্দনী খুশী হলো। হাসল। হাসলে চন্দনীকে বড় ভালো দেখায়। ও বিড়িগড়ে না জন্মালে রাজরাণী হতে পারত। হয়তো হয়েও ছিল। চন্দ্রকান্তর মতো রাজা ক'জন হয়? কিন্তু কপালে সইল না।

খেতে খেতে আমি বললাম, চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।

—কেন? বলল চন্দনী। ওকে খুব উত্তেজিত দেখাল।

—এমনিই।

—না। ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে না তোমার। গিয়ে বুঝি বলবে যে, আমি কি হয়েছি। দায়িয়ানী চন্দনীর গল্প করবে বুঝি? যাকে পাঁচ টাকায় যে কোনো হাড়গিলে সারারাত ধরে পেতে পারে?

বুঝলাম, পনেরো টাকার দশ টাকা তাহলে মাউসীই নেয়।

বললাম, তা না। ওকে খুঁজে বের করে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে ওকে কেউ ধরতে পারবে না। তোমার সঙ্গে বাকি জীবন শান্তিতে কাটাতে পারবে। ভালো তো ও তোমাকেই বাসে।

—ভা-লো-বা-সা!

বড় ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করল চন্দনী কথাটা।

তারপর বলল, ভালোবাসা না ছাই। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। ও মরে গেছে। তোমাকে আমি ওর জন্যে ডাকিনি। ও লোকটাও তোমাকে ডাকেনি। আমি ডেকেছি। আমাকে যে করে হোক উদ্ধার করো, এখান থেকে নিয়ে যাও। সম্মানের সঙ্গে

আমাকে বাঁচতে দাও বাকি জীবন। সব সাধই তো পূর্ণ হলো। নিজের ঘর, নিজের স্বামী, গরু-বাছুর, ছেলে-মেয়ে, সব, সব। এখন আমাকে দয়া করো।

আমি বললাম, চন্দ্রকান্তকে তো তুমি জানো। উনি কখনও নিজের সাহায্যের জন্যে কাউকে ডেকেছেন, না ডাকবেন ?

চন্দনী এবারে কঠিন হলো।

বলল, ওর কথা শুনতেই চাই না।

বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু উনি কোন জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন, জানো ?

চন্দনী কি ভাবল একটুক্ষণ, তারপর বলল, এখন কোথায় আছে জানি না। কিন্তু জানি যে, লবঙ্গীর জঙ্গলে পালিয়েছে। ঠিকাদার ছবি নায়েকের যে মুহুরী ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে আমাকে এনেছিল এখানে, সে আমার কাছে এসে রাত কাটায় সপ্তাহের একদিন। ওর মুখে শুনেছিলাম যে, দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে, রাতের বেলা মূল খুঁড়ে খায়, ফল পেড়ে খায়, যে কোনোদিন বাঘের পেটে কি বাইসনের গুঁতোয় শেষ হয়ে যাবে। শরীরের যা অবস্থা ছিল তাতে এমনিতেই শেষ হওয়ার কথা এতদিনে। এমনিতে শেষ না হলে যা করে বেঁচে আছে তাতে আর ক'দিন বাঁচবে ?

—লবঙ্গীর জঙ্গলে হাতী নেই ? আমি শুধোলাম।

—শুনেছি, এ সময়ে নেই। তবে যেতে কতক্ষণ ? জংলী হাতী তো আর বাঁধা থাকে না।

আমি বললাম, সৌমেনবাবুদের কাজ হচ্ছে এখন জুকুব্ ক্যাম্পে। চলো, তোমাকে নিয়ে আমি সেখানে যাই কাল। জুকুব্ তো লবঙ্গীর কাছেই। ওদের ক্যাম্পে থেকে, চন্দ্রকান্তর খোঁজও করব আর তোমার কি করা যায় তাও ঠিক করব।

চন্দনী বলল, তুমি কি পাগল হলে ? টিকড়পাড়ার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যে কোনো ঠিকাদারদের ক্যাম্প আছে তার মুহুরীরা সকলে আমার কথা জানে। কেউ কেউ আমার কাছে আসেও।

আমি এখন নামকরা নতুন দারিয়ানী। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমার মুখে থুথু দেবে সকলে। তোমার তো মান-সম্মান বলে একটা কথা আছে। তোমার এতবড় অসম্মান আমি হতে দেবো না।

আমি বললাম, আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না।

চন্দনী চটে উঠে ভুরু তুলে তাকালো আমার চোখে। বলল, হবে না কেন? আমি দারিয়ানী হয়েছি বলে কি আমার সব গেছে? কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তাও কি আমি বুঝি না, তাও কি বলার অধিকার নেই আমার?

আমি একটু চুপ করে থাকলাম।

তারপর বললাম, তাহলে চলো, তোমাকে নিয়ে নদী পেরিয়ে বিড়িগড়ে যাই বড়মূল, রিডসিলিঙা হয়ে। তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার আপনজনদের কাছে।

—না, না, না, আমার আপনজন কেউ নেই। বলে, চেঁচিয়ে উঠল প্রায় চন্দনী। বলল, ওরা আমাকে টাঙ্গী দিয়ে কেটে ফেলবে। বিড়িগড়ের কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত আমার মতো দারিয়ানী হয়নি। ওরা, আমার ভাই-বোন; আমার গ্রামের লোকেরা গরীব হতে পারে, কিন্তু আমি ওদের যোগ্য নই। আমি মরে গেলেও ওখানে যেতে পারব না। ওদের কাছে আমি মরে গেছি চিরদিনের মতো।

এবারে আমি রেগে গেলাম।

বললাম, তাহলে আমাকে কি করতে বল? কি আমি করতে পারি তোমার জন্যে?

চন্দনী মুখ তুলল। ওর দু'চোখে জল।

পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নিল।

আমি ডাকলাম, চন্দনী।

চন্দনী খুব আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

অনেকদিন আগে এক চাঁদনী রাতে মহুয়া গাছতলায় একটা চিত্রল হরিণীকে মেরেছিলাম। দূর থেকে তার শিং আছে কি নেই

বুঝিনি। কাছে গিয়ে দেখি, হরিণী! তখনও তার প্রাণ ছিল। টর্চের আলো ফেলতেই দেখি তার চোখ-ভরা জল। চোখের নীচে কাজলরেখার মতো রেখা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। চন্দনীর চোখের সঙ্গে সেই হরিণীর চোখের বড় মিল। অনেক পাপ আমার।

আরো অনেক কথা মনে হলো। বাঁ হাত দিয়ে চন্দনীর গাল টিপে দিলাম। হাসলাম। বললাম, অত ভাবছ কেন? কিছু একটা করবই। দেখি, কি করা যায়!

চন্দনী, আমি ওর গাল ছোঁয়ায় খুব খুশী হলো; হাসল। বুঝলাম, ওর সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

আশ্চর্য! কত পুরুষ সন্ধ্যে থেকে রাতভর ওকে ময়াম-দেওয়া ময়দার মতো চটকায়, অথচ ওর গালে আমার আঙুল লাগতে এখনও সেই চন্দনীই শিউরে ওঠে।

আমরা বড় বোকা! মেয়েদের আমরা একটুকুও বুঝলাম না; আদম-ইভের দিন থেকে এত হাজার বছর একসঙ্গে থেকেও কিছুমাত্র বুঝলাম না।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে আমি আবার এঘরে এসে বসলাম, খাটে উঠে দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

চন্দনী বলল, খেয়ে আসছি এক্ষুণি আমি, তুমি ওঘরে বোসো।

আমি এঘরে আসতেই চন্দনী পান সেজে দিয়ে গেল আমায়। বিড়িগড়ের পাহাড়ের খন্দ্‌রা পান খায় না। কিন্তু সমতলে নেমে এসে এদের সঙ্গে মিশে ও পান খাওয়া শিখেছে। ওর কাছে যারা আসে তারাই শিখিয়েছে হয়তো।

গুণ্ডী খাই না আমি, ও-ও রাখেনা। এমনি পান, খয়ের, চুন আর সুপুরী দিয়ে বানিয়ে এনেছিল।

চন্দনী খেয়ে এলে বললাম, রাতারাতি এখান থেকে পালিয়ে গেলে কি হয়?

ও ভয় পেল! বলল, রাতে আমাকে নিয়ে পালালে তোমার

নামে থানা পুলিশ হবে। তুমিও কি ফেরারী হতে চাও?

কথাটায় আমার মজা লাগল। শহরে বসে, কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে দু-একটা চিঠি লিখে, (তাও যদি সব চিঠি প্রকাশিত হতো!) আমরা আমাদের চতুর্দিকের কত শত অন্যায়ের প্রতিবিধান করি বলে মনে করি। জেলে যেতে আমাদের বড় ভয়। বিবেকের নির্দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সারা জীবন প্রতিকারহীন ন্যক্কারজনক ভীরুতায় আমরা কাটিয়ে দিই, অথচ জেলের প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতে ভয়ে মরি। আমাদের রুজি-রোজগার স্ত্রী-পুত্র বিষয়-সম্পত্তি আমাদের হীন স্বার্থ এসে সবসময় বিবেকের পথ আগলে দাঁড়ায়। চন্দনীর জন্যে না হয় থানা-পুলিশ হলোই একটু। আমার মতো নিষ্ক্রিয় লোকের জীবনটাতো ঘোলা-জলের ডোবাই—তাতে না হয় একটু জলোচ্ছ্বাস জাগলোই—বিবেকের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে না হয় পুলিশের জেলে গেলামই।

—কিন্তু, চন্দনী বলল, আমি চলে যাওয়ার আগে এদের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে হবে। নইলে বিপদ আছে।

তারপরই বলল, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? কোলকাতা।

আমি ভয়ে নীল হয়ে গেলাম। আমার কি সে সাহস আছে? কোলকাতায় কি চন্দনী গিয়ে থাকতে পারবে? ওর সামাজিক মর্যাদা সেখানে কি হবে? কোন সম্মান দেবে তাকে আমার আত্মীয়রা, আমার শিক্ষিত উচ্চমন্য পরিচিতরা? তাছাড়া এই খোলা বনের মেয়ে তো ডিজেলের ধোঁয়ায়, অপমানে শুকিয়ে যাবে। ওকে কি ভাবে, কোন পরিচয়ে নিয়ে যাব আমার সঙ্গে? আমি যে মজ্জায় মজ্জায় ভীরু। কন্‌ভেন্‌শান্‌ ভাঙার জোর যে আমার বুকে নেই। বহুবছরের মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণত্ব আমাকে নীচ, সাধারণ, লোকভীত করে তুলেছে। না! আমার সে সাহস নেই। তাছাড়া চন্দনীকে নিয়ে গিয়ে ঝি করে রাখা যায় না। ওকে যা করে রাখা যায়, তা করে রাখতে পারব না। সেটা ওর অথবা আমার কারো

পক্ষেই সুস্থ বন্দোবস্ত নয়।

চন্দনী আবারও বলল, নিয়ে যাবে কোলকাতায়?

আমি বললাম, না। আমরা এখন লবঙ্গীতে যাবো। তুমি এখনও চন্দ্রকান্তর বিবাহিতা স্ত্রী। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা না করে, কথা না বলে কিছুই ঠিক করতে পারব না আমি। তুমি যাই-ই বল না কেন।

চন্দনী মুষড়ে পড়ে অধৈর্য গলায় বলল, কিন্তু আমার পরিচয় কি দেবে? জুকুব্‌ ক্যাপে তোমাকে চিনবে কত লোক। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি বলবে?

আমি বললাম, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—একশোবার ভাবতে হবে। এবার চেঁচিয়ে বলল চন্দনী।

তারপর বলল, তোমাকে ডেকে এনে ভুল করেছি। তারপর ভুরু উঁচিয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি রাতটা আমার ঘরে থাকো। টাকা দিয়েছ যখন থাকার জন্যে তুমি তো রাতের জন্যে কিনেই রেখেছো আমায়। এ রাতে তুমি আমাকে নিয়ে যা-খুশী তাই করতেও পারো, কিন্তু কাল ভোরে উঠেই চলে যেও এখান থেকে। টাকা উশুল করে চলে যেও। আমার জন্যে তোমার কিছুই করতে হবে না।

হঠাৎ আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো চন্দনীকে ঠাস্‌ করে এক চড় মারলাম।

চড় খেয়েই চন্দনী চুপ করে গেল। দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় মুখ গুঁজে শব্দ না করে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। ওর হাত থেকে পানটা মাটিতে পড়ে গেল।

কয়েকমুহূর্ত আমি কি করব এবং কি করলাম বুঝতে পারলাম না। তারপর ওকে হাত ধরে তুলতেই ও আমার বুকের উপর আছড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, তুমি আমার কে? আমাকে মারবার তুমি কে? আজ চন্দ্রকান্ত থাকলে তোমাকে গুলি করে মারত, তুমি কোন অধিকারে মারলে আমাকে? চলে

যাও, এক্ষুণি চলে যাও আমার ঘর থেকে।

আমি একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। কুকুরটা ভুক্ ভুক্ শব্দ করে ডেকে উঠল। আমি সোজা নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন অনেক রাত। জীপটা তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল। জীপের মধ্যে ঢুকে বসলাম। এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাবো ভাবলাম। কিন্তু পারলাম না। কোথায় যাবো, তাও ভেবে পেলাম না।

চাঁদের আলোয় দারুণ দেখাচ্ছে সাতকোশীয়া গণ্ডের মহানদীকে। ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে শম্বর ডাকল হঠাৎ। তারপর আবার সব চুপচাপ। যেখানে কুমীরের চাষ করছে ওড়িষ্যার বন-বিভাগ, সেখান থেকে কতকগুলো কুকুর ডাকতে লাগল। নদীর উপরে নৌকোর আলো। কে যেন পাটাতনের উপরে কি ফেলল। কাঠে কাঠে ধাক্কা লেগে একটা শুকনো ভোঁতা আওয়াজ হলো।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়ে গেছে। চায়ের দোকানী ঝাঁপ খুলেছে। এক কাপ গরম চা খেয়ে আবার চন্দনীর ঘরের দিকে গেলাম।

দোর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিতে অনেকক্ষণ পর চন্দনী দরজা খুলল। খুলেই আবার দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

মাউসী এসে আমার পাশে দাঁড়াল। মুখে-চোখে কুটিল হাসি। বলল, কি ব্যাপার বাবু? রাতে ছিলে না? চন্দনীকেও পছন্দ হলো না? তোমাদের ব্যাপার আলাদা। শহরে কত ভালো ভালো জিনিস দেখো।

মাউসীকে বললাম, আমি চন্দনীকে নিয়ে যেতে চাই।

মাউসী বলল, ক'দিনের জন্যে?

আমি বললাম, চিরদিনের জন্যে।

—কোথায়?

—তা জানি না।

—তুমি যদি মেয়েটাকে মেরে ফেলো? যদি বিক্রী করে দাও

কারো কাছে? মাউসী নিরুত্তাপে বলল।

বললাম, তাতে তোমার কি? তুমি কি চাও বলো?

মাউসী বলল, ও চলে গেলে ক্ষতি হবে আমার!

—ক্ষতি হবে বলেই তো তোমাকে এত কথা বলছি!

এমন সময় চন্দনী দরজা খুলল।

মাউসী বলল, কি রে ছুঁড়ি? রাতের বেলা বাবুকে খুশী করতে পারলি না? বাবু রাত কাটালো বাইরে! শিখলি কি এতদিনে?

চন্দনী কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কথা বলল না কোনো। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি মাউসীকে বললাম, আমার তাড়া আছে; বল, তুমি কি চাও?

তারপর চন্দনীকে বললাম, পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমার জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুণি যাবো।

মাউসী বলল, তিনশো টাকা চাই।

চন্দনী আঁতকে উঠে বলল, তিনশো টাকা? মাউসী, আমার রোজগারের দুগুণ তো তুমি রোজই নিয়ে যাও!

—তুই চুপ কর। বেশী কথা বললে ভীমকে ডাকব। তোদের দুজনকেই শায়েস্তা করে দেবে।

আমি মাউসীর দিকে চেয়ে বললাম, ভালো করে কথা বল চন্দনীর সঙ্গে। আর ডাকো তোমার ভীমকে। ভালোভাবে মেটালে মেটাও, নইলে এক পয়সাও দেবো না। ওকে জোর করেই নিয়ে যাবো। দেখি, তুমি কি করতে পারো?

বলতেই, মাউসী দৌড়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলল, বড় পীরিত দেখছি।

আমি বললাম, চন্দনী তাড়াতাড়ি করো।

চন্দনীর চোখে এবারে ভয় দেখলাম। আমার বিপদ দেখে ও নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল। ও বলল, তুমি পালাও, আমার

যা হয়, তা হবে। বাকি জীবন এখানেই থাকবো। ভীমরা এসে পড়লে তোমার খুব বিপদ হবে।

আমি বললাম, সময় নষ্ট কোরো না, শীগগির তোমার তোরঙ্গে জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে এসো।

চন্দনী কিছুক্ষণের মধ্যেই তোরঙ্গ আর পুঁটলি হাতে করে বেরোল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাউসীর সঙ্গে চারজন লোক লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল বেড়ার দরজা আগলে। তাদের চোখ মুখের ভাব ভালো না। ওদের পক্ষে আমাকে খুন করা তো বটেই, চন্দনীকেও খুন করা কিছু নয়।

কোমরে হাত দিয়ে চট করে পিস্তলটা বের করলাম আমি। বের করে, মাউসীকে বললাম, কি চাও? টাকা চাও? না গুলি খেতে চাও?

আমার কাছে পিস্তল থাকবে তা ওরা অনুমান করেনি। যে লোকের কাছে লাইসেন্সড্ পিস্তল থাকে তার মাথায় লাঠি মারলে তার পরেও নানা বিপদ তাদের হতে পারে এই বোধটুকু গুণ্ডাগুলোর ছিল।

ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি চন্দনীকে বললাম, হিপ্‌পকেট থেকে আমার মানিব্যাগ বের করে মাউসীকে তিনশো টাকা দিতে।

চন্দনী কখনও একশো টাকার নোট দেখেনি মনে হলো। মাউসীও দেখেনি। তিনটে একশো টাকার নোট হাতে পেয়ে মাউসীর মুখে হাসি ফুটল।

আমি বললাম, ভীমদের বলো যে, আমাকে আর চন্দনীকে জীপ অবধি পৌঁছে দেবে, যাতে পথে আর কেউ ঝামেলা না করে।

ভীমরা তাই-ই করল।

অত ভোরে পুরো বস্তী জাগেনি। কিন্তু যারাই জেগেছে তারাই সকলে রীতিমত শোভাযাত্রা করে আমাদের পেছন-পেছন এলো। চন্দনীর তোরঙ্গটা আমি বাঁ হাতে নিলাম। থালা-বাসন ক'টা

একটা শাড়ির পুঁটলি করে নিয়ে নিয়েছিল ও।

দোকানীরাও সকলে দোকান ছেড়ে পথে এসে ভীড় করল। টিকড়পাড়ার শান্ত আবহাওয়ায় এত বড় একটা উত্তেজনার ঘটনা বোধহয় বহুদিন ঘটেনি। ঘটেছিল একবার বহু বছর আগে, যখন কুমীর শিকারে এসে, এক সাহেব ও তার ছেলেকে কুমীরে ধরেছিল। মেমসাহেব কুমীর ছুটোকেই মেরেছিলেন। কিন্তু কুমীর মারার পর হুডখোলা ফোর্ড গাড়িতে স্বামী ও ছোট ছেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ পিছনের সীটে রেখে, অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে তিনি একা গাড়ি চালিয়ে এই ঘাট থেকে অংগুলের পথে যাচ্ছিলেন। তখনও এই ঘাটে খুব উত্তেজনা হয়েছিল।

পূর্ণাকোটের আগে পথের বাঁ পাশ দিয়ে একটা বড় সুন্দর নদী গেছে। ম[illegible]ীতে গিয়ে পড়েছে বোধহয় অনেক নীচে বিন্‌কেই-এর কাছাকাছি। সেই নদীর পাশে জীপ থামিয়ে, আমরা চোখ মুখ ধুয়ে নিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে চন্দনী একটু সেজে গুজে নিল। আয়নাটা আনতে ভোলেনি ও। বিড়িগড়ে ও অন্যরকম ছিল। চন্দনী অনেক বদলে গেছে!

তারপর পূর্ণাকোটে এসে চা-এর দোক[illegible]গুলা নিমকি এসব দিয়ে চা খেলাম আমরা।

পম্পাশরে এসে যখন ডাইনে মোড় নিলাম লবঙ্গীর ধুলিধূসরিত পথে, তখন চন্দনী শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করল, কোথায় চললে? এ-রাস্তা কোথায় গেছে?

আমি বললাম, লবঙ্গী, জুকুব্।

আমার দৃঢ় চোয়ালের দিকে চেয়ে আর চন্দনী কোনো কথা বলার সাহস করল না।

বাকি পথ একেবারে চুপ করে রইল।

মাঠিয়াকুছু নালার পাশে সৌমেনবাবুদের ক্যাম্প পড়েছে। ক্যাম্প মানে নালার পাশে পাতার তৈরী একটি বড় ঘর। উপরে পাতা, চতুর্দিকে পাতা। পাতাগুলো শুকিয়ে এসেছে। ঘরের

একপাশটা খোলা। সেই পাশটাতে রান্না-বান্না হয়। নারায়ণ রাঁধে। গেরুয়া-রঙা লুঙি পরা সিঁটিয়ে-যাওয়া নারায়ণ। আমার বহুদিনের চেনা। এক পুরোনো মুহুরীর ভাইপো রত্নাকর এই ক্যাম্পের ম্যানেজার। খুব বিদ্বান রত্নাকর। একাদশ ফেল। মানে একাদশ ক্লাসে উঠে ফেল করেছিল। বছর কুড়ি বয়স। এক ছেলে, এক মেয়ে। হাতে হাত ঘড়ি। বিদ্বান ছেলে বলে বিয়েতে সাইকেল পেয়েছিল পণ হিসাবে। নীল রঙা লুঙি ও হলুদ রঙা শার্ট পরেছিল ও। মুখের মধ্যে একটা গর্ব ও কর্তৃত্বর ছাপ।

জীপের শব্দ শুনে তখন ক্যাম্পে যারাই ছিল, তারাই ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। আমাকে দেখে নমস্কার করল। খুশী হলো ওরা সকলে।

চন্দনীকে দেখে ওরা অবাক হলো। চুপ করে রইল। আমি বললাম, আরেকটা পাতার ঘর বানাও। আমি থাকব। আর চন্দনীও থাকবে এখানে।

—কোথায় থাকবে ? আপনার ঘরেই ? রত্নাকর শুধোলো।

ওর গলায় শ্লেষের সুর বাজল।

চন্দনী মুখ নীচু করে থাকল, পুঁটুলি হাতে করে।

আমি বললাম, তেমন দরকার হলে তাই-ই থাকবে, তবে এখন কামীন্‌দের ঘরেই থাকবে।

—কোনো কামীন্ নেই আমাদের। রত্নাকর আবার বলল।

নারাণ বলল, কেন ? চন্দনী কম্ফুর সঙ্গে থাকতে পারে, ওর বউ ছেলের সঙ্গে।

—কম্ফু কে ? আমি শুধোলাম।

—কম্ফু জড়ি-বুটির বদ্যি। জঙ্গলের কবিরাজ। রত্নাকর বলল।

আমি বললাম, দরকার নেই। এখানেই চন্দনীর জন্যে আরেকটা ঘর বানিয়ে দে, দুজন লোক লাগা। আমি পয়সা দিয়ে দেবো।

রত্নাকর চন্দনীর এরকম প্রাধান্যটা ভালো চোখে দেখল না।

আমি বললাম, চন্দনী এখানে আমার অতিথি হয়ে থাকবে। খাবে দাবে, বিশ্রাম করবে; বেড়াবে। যখন ট্রাক আসবে আমি

সৌমেনবাবুকে চিঠি লিখে দেবো। আমাদের সঙ্গে যা-যা জিনিস আছে নামিয়ে নে। খাওয়ার দাওয়ার সব।

তারপর নারাণকে বললাম, নারাণ আমাদের রান্না কিন্তু তুই-ই করবি।

নারায়ণ গড় হয়ে বলল, আঁইগা।

সেদিনটা পুরো গেল পর্ণকুটির বানাতে। দুপুরে আলু ভাজা, ডাল ও কুমড়োর তরকারী রেঁধেছিল নারাণ। খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

বিকেলে, ক্যাম্পের সামনে নালার পাশে একটা বড় কালো পাথরের উপর বসে রত্নাকরের কাছে চন্দ্রকান্তর খোঁজ খবর নিলাম খুঁটিয়ে! ও যে খোঁজ জানে না তাই নয়, ফেরারী চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ও নিজেকে জড়াতে চাইলো না। বলল, আমরা বনে বাস করে বনবিভাগের শত্রুকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। এখন রাতে মোবাইল ইউনিট ঘুরে বেড়ায় জীপে করে রাইফেল ও আলো নিয়ে। এত গভীর জঙ্গলে আসে না যদিও তারা, কিন্তু আসতে কতক্ষণ? ইতি-মধ্যে একবার দারোগা হাইলজার্স কোম্পানির জীপ নিয়ে দিন পনেরো আগে আমাদের ক্যাম্পে এবং ভালুধরিয়া নালার পাশে মাইল চারেক দূরে ছবি নায়েকের ক্যাম্পেও ঘুরে গেছে। চন্দ্রকান্তকে ওরা খুঁজে বের করবেই। ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, আপনারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ। সৌমেনবাবুকে আপনি চিঠি লিখতে পারেন, কিন্তু আমরা বনবিভাগের ঠিকাদার। সৌমেনবাবু এসব জিনিস পছন্দ করবেন না। আপনি দেখবেন। তাছাড়া……।

তাছাড়া বলেই, ও চুপ করে গেল।

আমি বললাম, তাছাড়া কি?

রত্নাকর একটু দ্বিধা করে বলল, চন্দনীকে এনে আপনি ভাল করেন নি। আপনাকে লোকে যা-তা বলবে। আপনি কেন একজন দারিয়ানীর জন্যে এই ঝামেলায় জড়াছেন? পুলিশও এসে পড়তে পারে ওর খোঁজে। তখন আমাদের সকলেরই বিপদ।

আমি বললাম, তোদের কোনো বিপদে ফেলবো না। ওর দায়িত্ব আমার। পুলিশ এলে তোরা বলবি, তোরা কেউ জানিস না, আমাকে চিনিস না পর্যন্ত। আমি চন্দনীকে নিয়ে এসে এই নালার পাশে জলের সুবিধার জন্যে ঘর বানিয়ে আছি।

তারপর বললাম, তোরা নিশ্চিন্ত থাক। তবে এখানের সকলকে বলে দিস যেন চন্দনীর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার না করে, ওকে কেউ পুরোনো কথা না তুলে কষ্ট দেয়—ও আমার অতিথি।

রত্নাকর আমার কথাতে আশ্চর্য হলো। কিন্তু বুঝতে পারলো না আমার সঙ্গে চন্দনীর সম্পর্কটা কি? কিন্তু বোঝবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

রত্নাকরকে আরও শুধোলাম, চন্দ্রকান্তর কোনো খোঁজ জানিস না? সত্যি কথা বলছিস?

—না। রত্নাকর বলল। সত্যিই বলছি।

ওর মুখ দেখে বুঝলাম যে ও মিথ্যা কথা বলছে।

বললাম, তুই জানিস না তো কে জানে? সারা জুকুব্ ক্যাপ চষে বেড়াচ্ছিস, তোর লোকেরা কোথায় না কোথায় যাচ্ছে এই জঙ্গলে? আর একটা মানুষকে কেউ দেখে নি, এ-কথা আমি করিনা বিশ্বাস। সত্যি কথা বল্।

রত্নাকর আমার চোখে কি দেখল জানি না। ও আমাকে ক্যাম্প থেকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল।

তারপর বলল, আমি জানি না, কিন্তু কম্ফু ওর খবর জানে। বুনো পাতা ফলের খোঁজে ও বন-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় জড়ি-বুটি বানাবে বলে, ওর সঙ্গে নাকি দেখা হয় মাঝে-মাঝে।

তারপরই বলল, বাবু, একথা বলবেন না যেন কাউকে। কম্ফুকেও না।

আমি বললাম, কম্ফু কোথায়?

—জঙ্গলে গেছে, ফেরার সময় হলো।

রত্নাকর তারপর ফিরে গিয়ে তার ঘরে কাঠের হিসাব

করতে বসল।

চন্দনী ঘুমিয়ে ছিল তখনও। একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বোধহয় অনেক-অনেকদিন পর আজকে সন্ধ্যেয় বড় করে টিপ পরবে না চন্দনী, চোখে কাজল দেবে না, পয়সার প্রেমিককে দেহ দান করার জন্যে, ভাতের গন্ধের লোভে সেজেগুজে বসে থাকবে না। ভাতের গন্ধ বড় মিষ্টি। একমুঠো ভাতের জন্যে কত কী-ই না করে মানুষে। অথবা কে জানে? অনেকদিন পর আজ সন্ধ্যেবেলা ওর শরীরের কোনো দাবীদার নেই বলে কি ওর বড় ফাঁকা লাগবে?

বেলা পড়ে এসেছে। নেপালী ইঁদুরগুলো বড় বড় তেঁত্‌রা গাছের পাতায় পাতায় ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়াচ্ছে। ডালগুলো নড়ছে, পাতা কাঁপছে তির্‌তির্ করে, শেষ সুর্যের লাল আলো পাতায় পাতায় ঠিক্‌রে এসে চোখে লাগছে।

এ জঙ্গলে ময়ূর বোধহয় কম। কিংবা থাকলেও এদিকটাতে কম। ডাক শোনা যায় না। ধনেশ পাখি অনেক। বড়্‌কি ধনেশ। এরা বলে কুচিলা-খাঁই। ছোট্‌কি ধনেশকে এরা বলে ভালিয়া-খাঁই। কুচিলা গাছে আর ভালিয়া গাছে এদের বেশী দেখা যায় বলে এই নাম। জংলী মোরগ ডাকছে। কোটরার আওয়াজ আসছে পাহাড়ের উপর থেকে। এ সময় পলাশের সময়। পলাশে শিমূলে, নবজন্ম-পিয়াসী পাতাগুলোর লাল ও হলুদ রঙে জঙ্গল এক দারুণ সাজে সেজেছে। লাল অথবা হলুদের রঙে যে কত বিভিন্নতা, কত নরম ও গাঢ় যে তাদের বৈচিত্র্য, তা এই চৈত্রের জঙ্গলে না এলে বোঝা যায় না।

শিমূল ফুল খেতে বড় ভালোবাসে কোটরা হরিণ। ফুলটা ঠিক খায় না। ফুলের বোঁটা ও ভিতরের অংশটা খুব শখ করে খায়। খেয়ে দেখেছি; কষ কষ লাগে। কষায়ও তো একটা স্বাদ। ওদের হয়তো খেতে ভালো লাগে।

আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড় বেয়ে চাঁদ উঠেছে। একদিকে উদীয়মান চাঁদ, অন্যদিকে অস্তমান সূর্য, পশ্চিমাকাশে নীল উজ্জ্বল ধ্রুবতারা,

ঘরে-ফেরা বিভিন্ন পাখির ডাক সব মিলিয়ে কেমন নেশা নেশা লাগছে।

হঠাৎ দেখলাম, একজন বেঁটে-খাটো শক্ত চেহারার লোক, মাথার চুল আধ-পাকা, আধ-কাঁচা, কাঁধে টাঙ্গী ঝোলানো, হাতে কিছু গাছ-গাছড়া নিয়ে পাহাড়ের যে দিক থেকে কোটরা ডাকছিল সেদিকের পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে আসছে। লোকটার হুঁশ ছিল না কোনোদিকে। নিজের মনে এঁকে-বেঁকে পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছিল।

ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে বেড়ে উঠেছে, জঙ্গলেই জন্ম নেবার পর। ওর কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সব জঙ্গলের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। তফাৎ এইটুকুই যে, ওর জরা আছে; জঙ্গলের জরা নেই। প্রকৃতি নিজের বুকের কোরকে নিজেকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার মন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন, যে মন্ত্র মানুষকে দেননি। প্রতি বছর নতুন করে ফুল ফোটে তার বুকে, নতুন প্রজাপতি ওড়ে, হরিণের শিং খসে গিয়ে নতুন শিং গজায় কিছুদিন পরে, সাপ তার পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন চিকনতার খোলসে ঢেকে নেয় নিজেকে। হতভাগা মানুষরাই শুধু নিজের এক খোলসের মধ্যে বন্দী থাকে আমৃত্যু। মৃত্যু এসে তাকে আবার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। একদিকে নদীর পারে চিতার ধুঁয়ো নিভে আসে, অন্যদিকে নবজাত শিশুর কান্না ভাসে পাতার কুঁড়ে থেকে। সেই শিশু বড় হয় একদিন। এক ফুল থেকে প্রজাপতি অন্য ফুলে গিয়ে বসে। তার পায়ে-মাখা পরাগ মাখামাখি হয়ে যায়, অন্য ফুলে ফুল জন্মায়।

লোকটা প্রায় আমার কাছে এসে গেল।

পাকদণ্ডীর নীচে সমতলে নেমেই হঠাৎ আমাকে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে একমুহূর্ত তাকিয়েই, আমাকে নমস্কার করল।

এটা প্রীতির নমস্কার নয়। ভয়ের নমস্কার। আমরা চিরদিন ওদের ভয়ের নমস্কার নিয়েই খুশী থেকেছি। ওরা আমাদের বিশ্বাস

করে না। আমরা ওদের চিরদিন ঠকিয়ে এসেছি।

কখন কম্ফু নমস্কার করে চলে গেছিল খেয়াল করিনি। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিয়েছে পাতায় পাতায়। কট্-কটি আওয়াজ হচ্ছে শালি বাঁশের বনে বনে। অর্জুন গাছের পাতা নড়ছে হাওয়ায়। ক্যাম্পের মধ্যে আগুনের শিখা কাঁপছে। বলদ-গুলো মাথা নাড়ছে তাদের। গলার ঘণ্টা সন্ধ্যার নির্লিপ্ত অন্ধকার মথিত করে টুং-টাং বেজে উঠছে। একটি বাচ্চা ছেলে কেঁদে উঠল। কম্ফুর ছেলে বোধহয়। কম্ফু সবে ফিরল। খাওয়া-দাওয়া করুক।

তারপর ওর কাছে যাবো।

আবছা চাঁদের আলোর বুটিকাটা গালচেতে নরম পা ফেলে ফেলে কে যেন এগিয়ে আসছে এদিকে।

কাছে এসে বলল, আসব ?

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, চন্দনী।

বললাম, এসো, এসো। ঘুম হলো ? বোসো।

ও বলল, আমাকে কিছু কাজ দাও। তোমাদের রান্নাটা করি আমি। বসে থেকে বড় খারাপ লাগবে।

আমি নারাণকে ডাকলাম।

নারাণ এসে দাঁড়াল। এই নারাণ সেই ধরনের লোক, যারা সংসারে অনেক কিছু পেয়েও ধরে রাখতে পারে না। সবাই, সবই ছেড়ে যায় তাদের।

পূর্ণাকোটে বাড়ি ছিল নারাণের, ছিল চাষের জমি, ডাগর বউ ছিল, ছেলে ছিল একটা ফর্সা। কিন্তু পূর্ণাকোটে মদের দোকানও ছিল একটা সর্প গাছের নীচে। পানমৌরী এবং অন্যান্য মদ বিক্রী হতো সেখানে। তার বৌকে নিয়ে গেল তার এক বন্ধু। বড় ধাক্কা খেয়েছিল নারাণ। কিসের টানে কে জানে, বৌটা ছেলেটাকে পর্যন্ত ছেড়ে গেল। তারপর বর্ষার দিনে গোখ্‌রো সাপের কামড়ে মারা গেল ছেলেটাও। ভিটে গেল, জমি গেল ; যা ছিল থাকার, সবই ছেড়ে গেল নারাণকে একে একে। কিন্তু নেশা ছাড়েনি। এখন অন্য কোনো

নেশার পয়সা জোটে না। সকালে বিকেলে আফিং খায়।

একদিন একটা কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল নারাণকে—বিছেটা মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওর শরীরে এত বিষ জমেছে। নারাণ হাসে আর বলে, আরও কিছুদিন যাক, আমাকে কামড়াতে গিয়ে যেদিন নাগসাপ মরবে, সেদিন আমার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো আমি।

বড় সুন্দর হাসে নারাণ। ওর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে একটা গামছা, একটা খাটো ধুতি আর একটা ছেঁড়া হাফ-শার্ট। অস্থাবর সম্পত্তি কিছুই নেই আর। কিন্তু এমন সুন্দর উজ্জ্বল হাসি আমি বড় কম দেখেছি। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, অনুযোগ নেই। কাজ করছে, আফিং খাচ্ছে, কাজের শেষে রাতে বসে ভগবানের গান গাইছে। নারাণ যখন গান গায়, তখন ওর সামনে বসে থেকেছি আমি অনেকদিন। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে নারাণের। সেই মুহূর্তে ও যেন আমাদের ছেড়ে, ওর এই পরিবেশ ছেড়ে কোথায় কোন ঊর্দ্ধলোকে পৌঁছে যায়—যেখানে কষ্ট নেই, ক্ষিদে নেই; যেখানে মৃত পুত্রের শোক নেই; বিশ্বাসঘাতিকা স্ত্রীর অস্তিত্ব নেই। নারাণের মধ্যে ওর দীনবন্ধুর কোনো এক কণা যেন প্রোথিত হয়ে গেছে। ও সাধারণ হয়েও বড় অসাধারণ।

নারাণকে বললাম, চন্দনী বলছে যে, কাল থেকে ও আমাদের সকলের রান্না করবে।

নারাণের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, আমার রোজ তাহলে কে দেবে বাবু? আমার আফিং?

আমি হাসলাম। বললাম, আফিং না হয় খাওয়া বন্ধই করলি!

নারাণ চমকে উঠল। বলল, ও কথা বোলো না বাবু। আমি একদিনও বাঁচবো না তাহলে। আমার কে আছে এই ভব সংসারে? দীনবন্ধু আর আফিং ছাড়া?

আমি বললাম, আমি যে ক'দিন আছি, তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। তোর রোজ আমি দেবো। তুই চন্দনীকে রান্না করতে দে।

ও খুশী হয়ে ফিরে গেল।

হাওয়াটা জোর হচ্ছে বনের ভিতর। পাহাড়ের ধাক্কা খেয়ে নীচে নেমে আসছে হাওয়াটা। জ্যোৎস্নাও জোর হচ্ছে আস্তে আস্তে।

চন্দনী পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় সুন্দর শরীরের গড়ন চন্দনীর। কি যেন মেখেছে মুখে, করৌঞ্জের তেল-টেল হবে। বনের ফুলের গন্ধ ছাপিয়ে সে গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার।

চন্দনী বলল, আমাকে নিয়ে খুব ভাবনায় পড়েছ না?

আমি বললাম, অন্য কথা বলো।

এমন সময় রত্নাকর এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

বললাম, কিরে রত্নাকর? কস্ফুকে আমার কথা বলেছিস?

—বলেছি। ওর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ও-ই আপনার কাছে আসবে।

তারপর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, নারাণকে আপনি বলেছেন যে, চন্দনী আমাদের রান্না করবে কাল থেকে? তারপর আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলল, তাতে অসুবিধে আছে।

আমি হেসে বললাম, কিসের অসুবিধা?

রত্নাকর চন্দনীর চোখে তাকিয়ে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বলল, ও দারিয়ানী! ওর হাতে আমরা কেউ খাবো না। আপনি যদি জোর করেন তাহলে কিন্তু এই ক্যাম্পের কাজ চালানো মুশকিল হবে।

এতটা আমি আশা করিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। এটা সৌমেনবাবুর ক্যাম্প। আমার জন্যে তার ব্যবসার ক্ষতি হয় এ আমি চাই না। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম আমি।

বললাম, ঠিক আছে। কাল সকালে আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব।

রত্নাকর ভয় পেয়ে গেল। বলল, আমি তো তা বলিনি বাবু। আপনি চলে গেলে সৌমেনবাবু জানতে পারলে আমার চাকরী

থাকবে না। আমি তো আপনাকে চলে যেতে বলি নি।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আর কোনো কথা নেই।

রত্নাকর চলে গেল।

এই একাদশ-ফেল, হাতে রিস্টওয়াচ পরা লোকগুলোই এই জঙ্গল পাহাড়ের লোকগুলোর সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাদের চেয়েও বড় শত্রু ওরা ওদের স্বজনদের। ওদেরও দোষ নেই। ওরা আমাদের দেখেই প্রভুত্ব করতে শিখেছে। আমরাই টাকার লোভ, ক্ষমতার লোভ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি প্রতিদিন। এই প্রত্যেকটা অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী, গর্বিত, ক্ষমতালোভী লোকগুলোর মধ্যে অত্যাচারীর বীজ লুকোনো আছে। এদের অনেক ভয়। চাকরী হারানোর, সম্পত্তি নাশের। রত্নাকরটা দেখতে দেখতে অমানুষ হয়ে উঠছে চোখের সামনে! কুড়ি বছরেই যদি এই, তো ষাট বছরে এই রত্নাকর কি মহীরুহতেই না রূপান্তরিত হবে!

আমি চুপ করে রইলাম।

চন্দনী আমার কাছে এলো। বলল, সাধ মিটেছে? এত করে বললাম, আমাকে এনো না। তা না, আমাকে মেরে ধরে নিয়ে এলে। দেখছো তো, কত বড় গলার কাঁটা আমি।

আমি বললাম, তুমি চুপ করো তো! কাল আমরা নিজেরা আরো উপরে গিয়ে এই নালার পাশেই ঘর বানিয়ে নেবো। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো। তুমি রাঁধবে বাড়বে কাল থেকে। আর আমি চন্দ্রকান্তকে খুঁজব।

চন্দনী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, তুমি এই এতলোকের সামনে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ থাকবো।

তারপর বললাম, কেন, তোমার আপত্তি আছে?

চন্দনী মুখ নীচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বলল, আমার······

বলেই, চুপ করে গেল।

বলদগুলোকে ওরা এই জঙ্গলে নিয়ে আসে পাহাড় থেকে কাটা কাঠ টেনে নামাবার জন্যে। পম্পাশরের বড় রাস্তা থেকে লবঙ্গীর জঙ্গলের এতখানি ভিতরে ওদের হাঁটিয়ে আনা যায় না। প্রথমতঃ সময় লাগে অনেক। দ্বিতীয়তঃ পথে বাঘের ভয়। ক্যাম্পে লোকজন থাকে। সারারাত আগুন জ্বলে। ক্যাম্পের আশে-পাশেও কুলীদের ঝুপড়ি থাকে। বাঘ সহজে সাহস করে না ক্যাম্পে আসতে। তাছাড়া মোষ ও বলদগুলো একসঙ্গেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে যে বাঘ কাছাকাছি না আসে, তা নয়। তখন বলদ ও মোষগুলো এক-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে ভঁস্‌স্‌ ভঁস্‌স্‌ করে নিশ্বাস ফেলে, জোরে জোরে শিং নাড়ায়। ওদের গলার ঘণ্টাগুলো জোরে বেজে ওঠে। লোক-জনের ঘুম ভেঙে যায়। ওরা হল্লা করে, টিন বাজায়, মশাল জ্বালায়। বাঘ সরে যায়।

হাঁটিয়ে যেহেতু আনতে পারেনি, তাই কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রাকের জন্যে যেই রাস্তা হয়ে গেছিল, অমনি ট্রাকে করে বলদ-গুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। এই বলদটা, চুলের কাঁটার মতো এক বাঁকে যে, কখন ট্রাক থেকে নীচের খাদে পড়ে গেছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। ক্যাম্পে এসে খেয়াল হয়েছিল। পরদিন খোঁজ করতে করতে দেখা গেল বেচারী পা-ভেঙে, পড়ে আছে খাদে। খাদ বেশী গভীর না থাকায় প্রাণে বেঁচে গেছিল বেচারা।

এখন সেই ভাঙা পা সারাচ্ছে কম্ফু। একটা লাল রঙা ওষুধ তৈরী করেছে ও। কচি শিমূলের গোড়ার শিকড়, হাড়কঙ্কালির ছাল, পুটূকাসিয়া লতার গোড়া, বুড়ো শ্যাওড়ার ছাল বেটে জড়া তেল দিয়ে ওষুধটা বানিয়েছিল ও। তারপর সেই ওষুধ লাগিয়ে ডবা বাঁশ কেটে স্প্লিণ্টার তৈরী করে তা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল পা।

একটা শলাই কাঠের মশাল মাটিতে পুঁতে, জায়গাটা আলোকিত

করে হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে বসে ওষুধ লাগাচ্ছিল কম্ফু বলদটার পায়ে। বলদটার তুটো বড় বড় উজ্জ্বল চোখে ওর শরীরের ব্যথা প্রতিফলিত হচ্ছিল।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

কম্ফু নিজের মনে বিড়বিড় করে কিসব বলছিল। ওষুধ লাগানো হয়ে গেলে বাঁশের স্পিণ্টার তুটো নতুন লতা দিয়ে আবার ভালো করে বেঁধে দিল ও বলদটার পায়ের সঙ্গে।

আমি শুধোলাম, সেরে উঠছে?

কম্ফু বলল, তা তো বটেই। তবে পুরো ভালো হতে আরো সময় লাগবে। গত সপ্তাহে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এ সপ্তাহে রোজ অনেকক্ষণ সময় দাঁড় করিয়ে রাখছি। শীগগীরই কাজে লাগতে পারবে। তারপর, যেন একটু বিষণ্ণ হয়েই বলল, এর কাজ শুরু হলেই, আমার কাজ শেষ।

এখানে একটা বলদের দাম আজকাল অনেক। একজন মানুষের জীবনের চেয়েও বেশী। চিকিৎসার জন্যে বহুদূর জঙ্গলের বস্তী থেকে কম্ফুকে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছে রত্নাকর, ক্যাম্পের ম্যানেজার। বলদ এবং মানুষেরও চিকিৎসার জন্যে।

তখনকার মতো চিকিৎসা শেষ হলে কম্ফু বলল, চলো বাবু, কি বলবে আমাকে শুনি।

আমরা তুজনে ক্যাম্পের সামনের উঁচু পথটাতে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে তুটো পাথরে বসলাম।

কম্ফুকে বললাম, তুমি চন্দ্রকান্তকে দেখেছো?

কম্ফু কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর চোখে চেয়েই বলল, হ্যাঁ। দেখা তো হয়। মাঝে-মাঝে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তেমন তো জংলী জানোয়ারের সঙ্গেও দেখা হয়।

—থাকেন কোথায়? আমি শুধোলাম।

—তা জানি না, তবে দেখা হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। জঙ্গলের

মধ্যে। দিনে বিশেষ বেরোয় না। রাতে বেরোয়। বাঘের জাত তো!

তারপর আবার অনেকক্ষণ থেমে স্বগতোক্তির মতো বলল, মরবে কোনদিন সাপের কামড়ে। গরম তো পড়ছে আস্তে আস্তে।

—এই দিকে কোন সাপ বেশী?

—সব সাপই আছে। তবে ভয় বেশী শঙ্খচূড়কে। তেড়ে এসে ধাওয়া করে ছোবলায়।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমার সঙ্গে চন্দ্রকান্তর কথা হয়?

—কি কথা? বলেই, কম্ফু আমার চোখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, কোনো কথা।

কম্ফু বলল, হয়; কিছু কিছু।

বুঝলাম কম্ফু আমার কাছে সহজ হতে পারছে না।

কম্ফু আমাকে শুধোল, তুমি এতদূরে এসেছো কেন চন্দ্রকান্তর খোঁজে? চন্দনীর সঙ্গে আবার বিয়ে দেবে?

আমি বললাম, চন্দ্রকান্ত, আমার বন্ধু হন। তা ছাড়া চন্দনীর জন্যেও এসেছি। ওদের যখন বিয়ে হয় তখন আমি ছিলাম বিড়িগড়ে।

কম্ফু গম্ভীর মুখে বলল, বিয়েটা তোমাদের না দেওয়াই উচিত ছিল। যে মরদ বউয়ের দেখাশোনা করতে পারে না তার বিয়ে করা কেন? চন্দ্রকান্তর আর যে গুণই থাক না কেন, বউ-এর সঙ্গে ব্যবহারটা ভালো করেনি সে।

তারপর হঠাৎ কম্ফুর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুধোল, তুমি কখনও বিড়িগড়ের দুর্গে গেছ?

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

কম্ফু বলল, ঐ দুর্গের কাছে একটা লতাঝোপ আছে, সেই লতার রস থেকে একটা ওষুধ বানিয়ে তা দিয়ে আমি কর্কট রোগ সারাতে পারি।

—ক্যানসার?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

কম্ফু বলল, ক্যানসার কি জিনিস? কোনো জানোয়ার? আমাদের জঙ্গলে-পাহাড়ে ও জানোয়ার নেই। আমি কর্কট রোগের কথা বলছি।

তারপর বলল, তুমি আমাকে ঐ দুর্গে কখনও নিয়ে যেতে পারবে?

আমি বললাম, পারি। তুমি চন্দ্রকান্তর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও।

কম্ফু আমার চোখের দিকে আবার তাকাল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, তুমি জাতে ব্যবসাদার?

আমি হাসলাম। বললাম, না। কিন্তু চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

কম্ফু আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল। বলল, সে তোমার বরাত।

বলেই, হাতের লাঠিটা নিয়ে মাটিতে ঠুকতে লাগল। লাঠির মুখটা একেবারে সাপের ফণার মতো।

আমি লাঠিটা একটু চাইলাম ওর কাছে, দেখব বলে।

কম্ফু লাঠিটা এগিয়ে দিল।

লাঠিটা আশ্চর্য! এরকম লাঠি আগে কখনও দেখিনি।

কম্ফু বলল, এটা জাদু করা লাঠি। জামো পেন্নু, ম্রিভি পেন্নু, কাটি পেন্নু, সকলের আশীর্বাদ আছে এতে।

—ওরা তো খন্দদের দেবতা। তুমি কি খন্দ না কি?

আমি শুধোলাম।

কম্ফু বলল, ভগবান কি কারো কেনা নাকি? যে যাকে মানে, সেই-ই তার ভগবান।

আমি বললাম, তা ঠিক।

তারপর বললাম, তুমি কাল যখন জঙ্গলে যাবে আমাকে নিয়ে যাবে?

কম্ফু বলল, আমি সারাদিন কত ক্রোশ ঘুরি লতা-পাতা জোগাড় করতে, তুমি পারবে কেন অত কষ্ট করতে ? শহুরে বাবু।

আমি বললাম, নিয়েই চলো না। পারি কি না পরখ করো।

কম্ফু বলল, সে বড় অসুবিধে। আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই তোমার।

তারপর বলল, ধরো যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় চন্দ্রকান্তর সঙ্গে, তোমার কথা কি বলব ?

আমি বললাম, বোলো, বিড়িগড়ের শালাবাবু এসেছে তার খোঁজে। আরও বোলো, চন্দনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমরা দুজনেই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বলব। কম্ফু নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল।

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, তাহলে নিশ্চয়ই কাল দেখা হবে তোমার সঙ্গে চন্দ্রকান্তর।

কম্ফু এবার চমকে উঠল।

এড়িয়ে গিয়ে বলল, বললাম না, কখনও কখনও দেখা হয়ে যায়।

আমার মনে হলো কম্ফু আমাকে মিথ্যা বলছে। ওর সঙ্গে হয়তো রোজই দেখা হয় চন্দ্রকান্তর।

কম্ফুকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও। ভালো বকশিস্ দেবো।

কম্ফু অদ্ভুত এক হাসি হাসল।

বলল, টাকা দিয়ে কি করব আমি ? চলে যাচ্ছে তো বেশ ! তাছাড়া এই জঙ্গলে টাকাও যা, কাগজও তাই।

আমি অবাক হলাম। বললাম, তোমার টাকার দরকার নেই ?

কম্ফু সগর্বে বলল, দরকার হয়নি।

—তোমার বউ ছেলে ? আমি শুধোলাম, ওদেরও দরকার নেই ?

—কিসের দরকার ? আমার বউ অন্য দশজনের বউ-এর মতো নয়, সে কম্ফু বদ্যির বউ। তার কাছে টাকার চেয়ে ইজ্জতের দাম বেশী। আর আমার ছেলেকে আমি আমার মতো বদ্যি করতে চাই। ও

গ্রামে গঞ্জে গেলে চাকরি খুঁজবে, বড় হলে ঠিকাদারের মুহুরী হবে, কারখানায় কাজ করবে, কি রাস্তা বানাবে। আমার নাম কম্ফ্ু। আমি মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। জঙ্গল ছেড়ে গেলে আমার মধ্যের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি খুব ভালো আছি। আমাকে টাকার লোভ দেখিও না।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে জীপ গাড়ি আছে। তোমাকে নিয়ে মহানদী পেরিয়ে বড়সিলিঙা হয়ে বড়মূল হয়ে, টাক্‌রা হয়ে, বিড়িগড়ে নিয়ে যাবো তাহলে লতার জন্যে। যাবে ?

—যাবো। খুশী হয়ে কম্ফ্ু বলল।

তারপর বলল, থাক্। আমাকে লোভ দেখিও না। লোভ জাগলে আর আমার ওষুধ ধরবে না। দেখছ না, পা-ভাঙ্গা বলদটা কেমন সেরে উঠছে। তোমাদের শহরের ডাক্তাররা পারতো ?

আমি বললাম, না।

—তবে ? কম্ফ্ু বলল।

তারপর বলল, বকশিসের দরকার নেই। আমি দেখব তোমার জন্যে কি করতে পারি।

বেশ বিপদে পড়লাম। কোনো একটা হদিস না পেয়ে এই নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে চন্দ্রকান্তকে খুঁজে বের করা সামান্য কথা নয়। কম্ফ্ুর সাহায্য ছাড়া তা প্রায় অসম্ভব। অথচ কম্ফ্ুর কতদিনে দয়া হবে বোঝা যাচ্ছে না।

খাওয়া দাওয়ার পর চন্দনী গিয়ে ওর ঘরে শুয়েছে এখন। আমি ঘরের বাইরে কাটা গাছের গুঁড়িতে বসে পাইপ খাচ্ছি। নালার পিছনের জঙ্গল থেকে একটা নাইটজার একটানা ডেকে চলেছে টাকু-টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। জ্যোৎস্নাটা অনেক জোর হয়েছে। আর ক'দিন বাদেই দোল পূর্ণিমা। পাহাড় থেকে হনুমান ডাকাডাকি করছে হুপ্‌-হুপ্‌-হুপ্‌-হুপ্‌ করে। সেই আওয়াজ ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নীচের উপত্যকায়। বাঘ বা চিতা দেখে থাকবে ওরা। রাস্তার পাশে কতগুলো গেণ্ডুলি গাছ। সাদা

নরম তাদের গা। এখন পাতা নেই—জ্যোৎস্নায় ওদের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখাগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। পত্রশূন্য ফলভরা আমলকী গাছের ডালে ডালে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে।

নারাণ গান ধরেছে—

"দয়া করো দীনবন্ধু শুভে যাউ আজ দিন
কড়জোড়ি তুম পাদে করুছি এ নিবেদন।
সত্য শান্তি প্রদায়ক, দুষ্ট দণ্ড বিধায়ক
রুক্‌ প্রাণনায়েক প্রভু পতিত পাবন॥"

রত্নাকর ধমক দিয়ে নারাণের ভজন থামিয়ে দিয়ে, নিজেও যে গান গাইতে পারে তা শোনাবার জন্যে চটুল গান ধরল।

"ফুলরসিয়ারে মন মোর ছুঁয়ি ছুঁয়ি যা
তো লাগি বিকশী চাহিছি একুঞ্জে
গুঞ্জন দেই যা যা।
যা না'রে ফেরি, আসি পাশে যা না
গা মন ভরি, করো না তু মনা
ঝুরিলে কি আউ আসিব এ দিন
হসি লেটি গাই যা-যা—
সাজি কেতে কুঞ্জে, কেতে ফুল সেজে
মহক্‌ ছটাই মরে নিতি লাজে
লাজ ত্যজি আজি করুছি আরতি
থরে ধীরে চাহি া॥"

রত্নাকরের সঙ্গীত প্রতিভা চন্দনীকে না জানালেই নয়।

বউ-ছেলে গ্রামে ফেলে বছরের মধ্যে আট-ন'মাস জোয়ান ছেলেগুলো জঙ্গলে পাহাড়ে পড়ে থাকে। এর মধ্যে চন্দনীর মতো একজন অতিসুন্দরী যুবতীর আগমনে অনেকেরই সঙ্গীতপ্রতিভা এবং আরও যাবতীয় প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। সকলেই চন্দনীকে ইম্প্রেস করবার জন্যে নিজের নিজের বিভিন্ন মাধ্যমে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে চন্দনী যে পয়সার বিনিময়ে করুণা বিতরণ

করেছিল নদীপারে, এ তো এদের সকলেরই জানা। এও জানা যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ চন্দ্রকান্ত আর এ-নারীর উপর কোনো দাবী রাখেন না। রত্নাকর প্রথমে কর্তৃত্ব দেখিয়ে চন্দনীকে আবিষ্ট করতে [illegible]ছিলো। আমার জন্যে সেপথে সুবিধা না হওয়ায় এখন মধুর পথে এগোতে চেষ্টা করছে।

রত্নাকরের গানের রেশ তখনো মিলিয়ে যায় নি, এমন সময় দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল। যারাই জঙ্গলে [illegible], জঙ্গলে আসা-যাওয়া করে, তারাই এ-শব্দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ এ।

যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের ঘুম ভেঙে গেল। যারা ঘুমোবে ভাবছিল, তারা উঠে বসল। আওয়াজটা ক্রমশ জোর হতে লাগল। আলোর আভাস দেখা যেতে লাগল খাদের পাশের উঁচু ঘোরালো রাস্তাটাতে।

আমি তাড়াতাড়ি একবার চন্দনীর ঘরের সামনে গেলাম। উঁকি দিয়ে দেখি ও জড়োসড়ো হয়ে দু'হাঁটু জড়ো করে দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে।

আমি বললাম, তুমি ঘরেই থেকো। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ দেখি কম্ফু লাফাতে লাফাতে নিজের ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার পাশে বসল। ওর হাতে সেই লাঠিটা। তারপর আমার সঙ্গে অর্গনগাছের ফলের টক রাঁধলে কেমন খেতে হয় তা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করে দিল।

জীপটা ক্যাম্পের আনাচ কানাচ আলোয় আলোকিত করে এসে দাঁড়াল।

তিন-চারজন লোক নামল জীপ থেকে। পুলিশের লোক নয়।

রত্নাকর ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে যে বেঁটে মতো লোকটি ড্রাইভারের পাশে বসেছিল, তাকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করল।

লোকটি বলল, দারিয়ানী চন্দনী এখানে এসেছে?

দারিয়ানী কথাটার উপর খুব জোর দিল লোকটা।

তারপর রত্নাকরকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেবার আগেই বলল, ওকে আমার চাই। ডাক্ ওকে। কাল সকালে ফেরৎ দিয়ে যাব। সত্যি! ছবি কথা রাখবে।

লোকটা জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল।

রত্নাকর ব্যাপার বেগতিক দেখে, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ বাবু নিয়ে এসেছেন চন্দনীকে। ওঁকে জিগ্‌গেস করুন।

আমি উঠে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়ালাম। লোকটার মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে দিশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। চোখ দুটো রাতের জানোয়ারের চোখের মতো চক্ চক্ করছিল।

আমি কিছু বলার আগেই লোকটা নিজের বুকে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল, আমার নাম ছবি নায়েক—আমি চন্দনীকে চাই। পয়সা দেবো। আমার এখুনি চাই ওকে। ওকি আপনার রাখন্তি?

লোকটার আস্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, চন্দনী আমার সঙ্গে এসেছে। এবং থাকবে। এক্ষুণি এখান থেকে চলে না গেলে বিপদ হবে, আপনি যেই হোন না কেন?

লোকটার পরনে ধুতি, বাফতার পাঞ্জাবী, গালের একটা দিক পোড়া—বেঁটে, গাট্টা-গোঁট্টা চেহারা। লোকটা অনেকক্ষণ ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, কিছু মনে করবেন না। অপরাধ নেবেন না।

বলেই জীপে গিয়ে উঠল।

কম্ফু বলল, পালান্ পালান্ ঠিকাদারবাবু নইলে ঝামেলা হবে।

ছবি ঠিকাদার বলল, যাচ্ছি ভাই; এখুনি যাচ্ছি।

বড় বিনয়ের সঙ্গে বলল কথাটা।

তারপর আমাকে বলল, চলি বাবু! রাগ করবেন না আমার উপর। অপরাধ হয়ে থাকলে, মাপ করবেন।

হঠাৎ, রোগা-পটকা নারাণ দৌড়ে এসে আমাকে বলল নীচু গলায়, বাবু সাবধান।

জীপটা চলে যেতেই কম্ফু‌ও যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনিই হঠাৎ চলে গেল, একটাও কথা না বলে।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, এ সাপ শঙ্খচূড়ের চেয়েও সাংঘাতিক। এর জাত জানেন? তারপর আমি কিছু বলার আগেই বলল, এর নাম বেনে-সাপ!

অপস্রিয়মাণ জীপের লাল টেইল-লাইটটা মিলিয়ে যেতেই নারাণ মাথা নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল :

"দোয়াপর যুগরে হরি গুপ্তে ররি গুপপুরী
দুষ্ট কংস্থক নিবারি রজা কল উগ্রসেন,
ভারতভূমি মধ্যরে সুদর্শন ধরি করে
পাণ্ডবংক ছলে হরি, কৌরবে কল দহন।
দয়া করো দীনবন্ধু মতে যাউ শুভদিন॥"

রত্নাকর ওকে ঠেলে ঘরে পাঠিয়ে দিল। বলল, আফিং জোর চড়ে গেছে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বাবু এরপর খুব গোলমাল হবে।

আমি বললাম, বুঝতে পারছি।

রত্নাকর বলল, ছবি নায়েক একবার এমনি করে কম্ফুর বউকেও জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটকে রেখেছিল। লোকটা ভালো না, ওর কাছে কুলির চেয়ে কামীন্ বেশী। সব কামীনের ডিউটি পড়ে ওর ঘরে রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে। লোকটা ঐরকমই। নন্‌সেন্স।

শেষ কথাটায় একটা ইংরেজী বলল, একাদশ-ফেল রত্নাকর।

আমি বললাম, কি হবে তা দেখা যাবে। এসব লোকের মেরুদণ্ড থাকে না।

রত্নাকর নারায়ণ ওরা সব চলে যেতেই চন্দনী আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার পিঠে হাত ছোঁওয়াল।

আমি চমকে উঠে তাকাতেই দেখি ভয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

আমি বললাম, চলো তুমি আমার ঘরেই শোবে। কোনো ভয় নেই তোমার।

আমার হোল্‌ডল্‌ বিছানো বিছানা পাতা ছিল। চন্দনী ওর কাঁথা নিয়ে এসে মাটিতে শুলো এক কোণায়। পা দুটো গুটিয়ে বুকের কাছে নিয়ে ভীরু শিশুর মতো শুয়ে পড়লো লজ্জায় মুখ ঢেকে।

আমি বললাম, আমার বিছানায় উঠে শোও। মাটিতে শুলে বিছে কামড়াবে।

ও অন্ধকারে উঠে বসল। যেন আমার কথা ওর বিশ্বাস হলো না। আমার নিজেরও বিশ্বাস হলো না আমার নিজের গলার স্বরকে।

চন্দনী হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আশ্রিত কোনো ভীরু জীবের মতো শুয়ে পড়ল।

একটু পরে দেখি ওর চোখের জলে আমার বিছানা ভিজে গেছে।

আমি বাঁ-হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকের কাছে টেনে আনলাম। চন্দনী আরামে, আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্তিতে আমার বুকের মধ্যে একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার ঘুম এলো না। পাতার ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরটার মধ্যে। চন্দনীর মুখে। ওর ঘুমন্ত চোখে। মাথায় ও কি তেল মাখে জানি না। কেমন একটা ফুল-ফুল গন্ধ ওর চুলে।

বাইরে কাক-জ্যোৎস্না। নাইটজার্ পাখিটা ডেকেই চলেছে টাকু—টাকু—টাকু—টাকু—টাকু। উপত্যকার উপরে জোৎস্নায় ভেসে ভেসে একটা পিউ-কাঁহা পাখি ডাকছে পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা। কোথায় যেন ওর প্রিয়া হারিয়ে গেছে, চন্দনীর স্বামীর মতো।

কোনো যুবতী নারীকে এত কাছে নিয়ে কখনও আমি শুইনি এর আগে। অবকাশ ঘটেনি। সারা বুকের, সারা অঙ্গের এত কাছে আঙ্গন নিয়ে কি কেউ ঘুমাতে পারে? চন্দনী অভ্যস্ত। ও ঘুমুলো কিন্তু সারারাত আমি শুয়ে শুয়ে বাইরের বসন্তবনের ফিস্‌ফিসানি শুনলাম। পিউ-কাঁহাটা সারারাত তার প্রিয়াকে ডেকেই গেল। তবু সাড়া দিলো না প্রিয়া।

বিছের কামড়ের হাত থেকে চন্দনী বাঁচল নিশ্চয়ই।

কিন্তু একটা অন্য বিছে আমাকে সারারাত কামড়ে মারল।

॥ ৫ ॥

সকাল হতে না হতে মেরামেণ্ডুলী থেকে ট্রাক এসে হাজির। জাল কাঠ বোঝাই করে ভুবনেশ্বর ফিরবে ওরা। ট্রাকের ড্রাইভার বিষেণ সিং ও হেল্পার অশোককুমার ছবি ঠিকাদারের কাণ্ড শুনে চটেই অস্থির।

আমি হাত মুখ ধুয়ে আসতেই নারাণ চা দিলো। বিষেণ সিং বলল, আমি বাবুকে গিয়ে বলব।

তারপর বলল, আপনি ওকে ছেড়ে দিলেন? বেঁধে রাখলেন না কেন?

আমি বললাম, মাতাল অবস্থায় মানুষ অসুস্থ থাকে, তখন সে মানুষ থাকে না। তাছাড়া ও তো আমার পায়েও পড়ল।

বিষেণ সিং হেসে বলল, ছবি নায়েক কখনই মানুষ থাকে না। চিজ্ একটি। আপনি ওকে চেনেন না বাবু। বিপদে পড়লে পায়ে পড়তে ওর এক সেকেণ্ড লাগে না, আবার বিপদ উদ্ধার হয়ে গেলে যার পায়ে পড়েছিল তার গলা টিপে ধরতেও এক সেকেণ্ড লাগে না। ও শালা জানোয়ারের চেয়েও ইতর।

ও শালা গাল-পোড়াকে আমি বহুদিন চিনি। শালা জাতহারামী। ওর আত্মসম্মান বলে কিছু নেই। ও গুয়ের পোকা।

বলেই, মাটিতে থুথু ফেলল, থুঃ করে।

তারপর উত্তেজনা প্রশমিত হলে বিষেণ সিং বলল, সারাদিন কাঠ লোড করে বিকেলের দিকে ওরা বেরিয়ে পড়বে। সন্ধ্যের আগে পাহাড়ের ঘাটিটা পেরিয়ে যেতে চায়। ওর হেল্পারের বড় ভুতের ভয়।

আমি জানতাম, বিষেণ সিংরা ক্যাম্পে থাকতে ছবি নায়েক কোনো ঝামেলা পাকাতে পারবে না। তাছাড়া এসব লোকের স্বভাব সাপের মতোই হয়। বাঘের মতো নয়। এরা মুখোমুখি প্রতিশোধ নেয় না। অনেক দিন ধরে মতলব আঁটে, অপেক্ষা করে। তারপর

সর্পিল গতিতে এগোয়। চোরা পথে।

চা খেয়ে চন্দনীকে বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কক্ষ্ আমার ওঠার অনেক আগেই বেরিয়ে গেছিল।

ক্যাম্পটার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা সৌমেনবাবুদেরই বানানো। তার সমান্তরালে আরও একটু উপর দিয়ে বনবিভাগের পথ চলে গেছে। বাঁ দিকে আঁকাবাঁকা পথে মাইল পাঁচেক গেলে লবঙ্গী ফরেস্ট রেস্ট-হাউস। বাঁ দিকে একটা মোড় পেরিয়ে সোজা গেলে, বরাবর গভীর খাদ বাঁদিকে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে রাস্তাটা সেগুন প্ল্যানটেশানের ভিতরে। যেখানে বাইসনদের আড্ডা। আর ডানদিকে নেমে গেলে রাস্তাটা অনেক মাইলের চক্কর ঘুরে এসে আবার মিশেছে লবঙ্গীর রাস্তায়। এখান দিয়ে একটা পথ দিয়ে টুম্বকার জঙ্গলেও গিয়ে পড়া যায়।

বড় গাছের নীচে নীচে অর্গন গাছ। কার্তিক মাঘ মাসে অর্গনের ফল ধরে। সুপুরীর মতো দেখতে ফলসা-রঙা জলপাই-এর মতো স্বাদ! টক্ করে খায় জঙ্গলের লোকেরা। অর্গনের পাতাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। চেরা-চেরা ঘন সবুজ পাতা। অর্গনের কচি পাতাও বর্ষাকালে টক্ করে খায় জংলী লোকেরা। এই ফল বিছানায় রাখলে ছারাপোকা হয় না।

এখন জঙ্গলে পত্রশূন্য গেণ্ডুলি গাছগুলোকে বড় সুন্দর দেখায়। এ অঞ্চলে গেণ্ডুলি গাছ হয়ও অজস্র। এই গেণ্ডুলির ডালের আঠা থেকে পলিস্টার ফাইবার হয়। প্রতি বছর তাই ইজারা হয় এই জঙ্গল। কুসুম গাছের লাল ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে চারিদিক। শিমূল, পলাশও ফুটেছে অনেক। বাঁশ-গাছে ফুল ফোটা শেষ। কিন্তু আম গাছে বোল এসেছে। তার মিষ্টি গন্ধে সকাল মন্থর হয়ে আছে। এখানে এত বড় বড় ও পুরোনো আম গাছ আছে যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না তারা কত পুরোনো। কত যে বয়স তাদের তা কে বলবে। সাদা সাদা ফুল ফুটেছে গাছে। আদিগন্ত লাল ফুলের মাঝে মাঝে এই সাদা ফুলগুলোকে ভারী ভাল দেখাচ্ছে।

কী দারুণ শান্ত, স্তব্ধ অথচ কী প্রাণবন্ত এই আদিগন্ত নিসর্গ ছবি। কোনোদিনও কোনো মানুষ শিল্পী, কোনো ভবিষ্যতের ক্যামেরা বা টি. ভি. এই ছবি আঁকতে পারবে না, ধরে রাখতে পারবে না। একমাত্র জীবন্ত মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই এই চৈত্র-সকালের গন্ধ শব্দ রূপ অনুভব করা যায়। এই দেখা, শোনা, বা সুবাসের কোনোই বিকল্প নেই। আমি তো বুঁদ হয়ে যাই সবসময়।

কোনো নেশা, কোনো নারীর নৈকট্য, পৃথিবীর কোনো প্রার্থিত বস্তুই আমার কাছে, প্রকৃতির কাছে থাকার চেয়ে বড় বলে মনে হয় না। কোনোদিনও।

চারধারে নজর করতে করতে চলেছি। চন্দ্রকান্ত নিশ্চয়ই কোনো গুহায় লুকিয়ে রয়েছেন সামনের পাহাড়ের গুহাগুলো খুব উঁচুতে, তাছাড়া ওদিকে পাহাড় একেবারে খাড়া। ঐ গুহাতে ভালুক অথবা শম্বর ছাড়া আর কারো পৌঁছনো সম্ভব নয়। বাঘ কি চিতা পারে হয়তো। কিন্তু যে ফেরারী মানুষের বারবার জঙ্গলে আসতে হবে গুহা থেকে বেরিয়ে, সে কখনও ঐ গুহায় আশ্রয় নেবে না।

সামনে একটা নালা, পথ কেটে গেছে। নালার একদিক চলে গেছে পাহাড়ের দিকে—যেখান থেকে নেমেছে নালাটা। অন্যদিকে গভীর উপত্যকা। এ জায়গাটা আমাদের মাঠিয়াকুহু নালার ক্যাম্প থেকে মাইল খানেক দূরে হবে।

হঠাৎ নালার ভেজা বালিতে একটি রাবারের জুতোর ছাপ দেখলাম। এ-অঞ্চলে জুতো-পরা লোক বেশী আসে না। এদিকটায় কোনো ক্যাপও নেই যে কোনো মুহুরীরা আসবে এ দিকে। তবে আসতেও পারে। জঙ্গলে একমাইল কোনো দূরত্বই নয়।

কি মনে হওয়াতে আমি ঐ জুতোর দাগ অনুসরণ করে উপত্যকায় নেমে গেলাম। গরমের দিনে গুহায় থাকার চেয়ে উপত্যকার ছায়ায় থাকাই হয়তো ঠিক মনে করেছেন চন্দ্রকান্ত।

একটা খবরে খুবই বিচলিত আছি সকাল থেকে। বিষেণ সিং বলছিল, অংগুলে, মেরামেণ্ডুলীতে, করত্‌পটায়, পূর্ণাগড়ে, পূর্ণাকোটে,

এমনকি শম্পাশরের মোড়েও পোস্টার দিয়েছে বনবিভাগ যে, যে চন্দ্রকান্তকে ধরিয়ে দেবে সে পাঁচ শো টাকা পাবে। পাঁচ শো টাকা, এখানে অনেক টাকা। যেখানে পাঁচ-দশ টাকায় সারারাত একজন নারীকে পাওয়া যায়, দেড়-দু টাকায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে একজন লোক সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়, সেখানে পাঁচ শো টাকার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে।

চন্দ্রকান্তকে এখান থেকে কোনোক্রমে সরিয়ে নিতে না পারলে চন্দ্রকান্ত আজ কি কাল গ্রেপ্তার হবেনই। গ্রেপ্তার করতে পারলে উদাহরণের কারণে খুব দীর্ঘ দণ্ডাদেশ যে হবে তার সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

এতসব কথা ভাবতে ভাবতে নালা দিয়ে নামছিলাম, হঠাৎ একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দে চমক ভাঙল। নুড়িটা নালার বাঁদিকের খাড়া পাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল। জলে কতগুলো ছোট ছোট ঢেউ উঠল।

একটা গর্ত মতো হয়েছিল, তাতে জল জমেছিল। সেখানে কতগুলো ব্যাঙাচি ও ছোট পাহাড়ী মাছ খেলা করছিল। সেই গর্তের মধ্যে পড়ল নুড়িটা। ব্যাঙাচিগুলো জলছড়া দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে গেল, আবার ওদিক থেকে এদিক। মাছগুলো জলের গভীরে চলে গেল। রোদ পড়ে জলের তলায় তাদের সঞ্চরমাণ শরীরে রোদটা লাফিয়ে উঠল ইয়ো-ইয়োর মতো।

আমি মুখ তুলে তাকালাম ওদিকে। তাকাতেই দেখি, নালার খাড়া পাড়ে একজন মানুষের পায়ের দাগ। সেটা জুতো পরা মানুষের, না খালি পায়ের বুঝলাম না; কারণ সে তাড়াতাড়িতে পাড়ে ওঠায় মাটি খসে গেছিল সেখান থেকে। নুড়িটা সেই মাটির ভেতর থেকেই গড়িয়ে এসেছে। একটু পরেই নালার ভিতরে নরম জল-ভেজা মাটিতে জুতোর গভীর দাগ দেখতে পেলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ঐ দাগ অনুসরণ করে উপরে উঠলাম, যথাসম্ভব কম শব্দ করে। উঠেই, সামনে হাত তিরিশেক দূরে একজন মানুষকে

একটা শিমূল গাছের আড়ালে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

লোকটির পোশাক খাকি। বেশ শক্ত সমর্থ মাঝারি চেহারা। আমি তার পেছনটা মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম শুধু।

দেখেই আমি লুকিয়ে পড়লাম গাছের আড়ালে। খুব ভাবনা হলো আমার। লোকটা কে হতে পারে? লোকটা চন্দ্রকান্ত হতেই পারে না। লোকটা কফ্‌ও নয়। তবে কি লোকটা পুলিশের লোক? চন্দ্রকান্তকে ধরবার জন্যে কোনো লোক কি এই বিপদসংকুল জঙ্গলে আমারই মতো তার খোঁজে এসেছে একা একা। কিন্তু যত বড় গোয়েন্দাই সে হোক না কেন, এ-জঙ্গলে যে শিকারী নয়, যে ছোট-বেলা থেকে বনে জঙ্গলে না ঘুরেছে, তার পক্ষে শুধু পুলিশী বিদ্যা নিয়ে একা-একা চন্দ্রকান্তর পিছু নেওয়া সম্ভব নয়।

না কি লোকটা চন্দ্রকান্তই? আমি কি ভুল করলাম?

আমার অঙ্ক সব গোলমাল হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা এখন অনেক জটিল হয়ে পড়ল। চন্দ্রকান্ত, ছবি নায়েক, এই খাকি পোশাকের লোকটা, পুলিশ, বনবিভাগ—এ রীতিমত গোলক-ধাঁধায় পড়া গেল।

একবার মনে হলো চন্দনী যাই-ই বলুক, আমি ওকে বিড়িগড়ে ওর আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে কোলকাতা ফিরে যাই। কে ঘরের খেয়ে অফিসের ছুটি নষ্ট করে এই গোলক-ধাঁধায় ঘুরে মরবে দিনের পর দিন? যে লোক নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে এমন করে অসহায় অসম্মানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, তার প্রতি অথবা তার স্ত্রীর প্রতিই বা আমার কর্তব্য কি? আমি তাদের কে? যে এই অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলব?

আস্তে আস্তে বড় রাস্তায় ফিরে এলাম। এখানে আমি নিরাপদ। বড় রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। কেউ যদি দেখেও ফেলে, সন্দেহের কিছু নেই।

এদিক ওদিক আরো কিছুটা ঘোরাঘুরি করে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন অনেক বেলা।

ফিরে দেখলাম, চন্দনীকে রত্নাকরের দলবল আগে থেকে অনেক

সহজ করে নিয়েছে। রত্নাকরকে দেখলাম না। ক্যাম্পের আঙিনা কাঁচা অর্গন পাতার ঝ্যাঁটা দিয়ে ঝাড় দিচ্ছে চন্দনী। জলের ছিটে দিয়ে ধুলো মারছে চারদিকের।

দেখে খুব ভালো লাগল। নারাণকে আরেক কাপ চা খাওয়াতে বলে, একটা বড়, প্রায় একশো বছরের পুরোনো আমগাছের হাতীর পেটের সমান মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে, মাথা থেকে বেরে ক্যাপটা খুলে ফেলে পাইপে তামাক ভরতে লাগলাম আমি! এখন অনেক অনেক ভাবার আছে আমার। ভেবে কোনো কুলকিনারা পাব কিনা জানি না, কিন্তু চন্দ্রকান্ত মহা ঝামেলায় ফেললেন।

নারাণ চা দিয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিচ্ছি, আর পাইপ খাচ্ছি আর ভাবছি। চায়ে বড় দুধ-চিনি দেয় এরা। নারাণরা দুধকে বলে ক্ষীর। গরুর দুধ নয়, টিনের দুধ। গরুর দুধ হয়ত পাওয়া যেত লবঙ্গী বস্তীতে গেলে, কিন্তু এখানে দুগ্ধ-পোষ্য এমন কেউ নেই যার গরুর দুধ না হলে চলে না। কম্ফুর ছেলে আছে অবশ্য, দেড় বছরের, কিন্তু এরা মায়ের বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ খাওয়ার ভাগ্য করে আসেনি। ভগবান করুন, মায়ের বুকের দুধ খেয়েই যেন এরা মরদ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ টিক্‌-চুঁই, টিক্‌-চুঁই-ই-ই-ই করে পর পর দুবার আওয়াজ হলো রাইফেলের।

সামনের পাহাড়ের ওদিকের ঢালে হলো আওয়াজটা। পাহাড়ে-পাহাড়ে গাছ-পালায় ধাক্কা খেয়ে আওয়াজটা উপত্যকার গভীরে হারিয়ে গেল। তারপর আবার চুপচাপ।

রত্নাকর কাজে গেছিল ক্যুপে। নারাণ কচি শিমুলের মূল আর লাল আলু দিয়ে একটা নতুন পদ রান্না করতে ব্যস্ত ছিল। চন্দনী আঙিনা নিকোনো সেরে নালার নীচের দিকে, যেদিকে বড়-বড় পাথরের আড়াল আছে, সেখানে চান করতে গেছিল। কম্ফুর ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে, হেঁটে ওদের ঝুপড়ির সামনে ধুলোর মধ্যে বসে একটা ফেলে দেওয়া এক-লিটারের মবিলের টিন নিয়ে খেলা করছিল। ওর

মা ছিলনা সেখানে। জঙ্গলে গেছিল কাঠ কুড়োতে। মূল খুঁড়তে।

গুলির আওয়াজে নারাণ দৌড়ে এল। ছেলেটা চমকে উঠে এক মুঠো ধুলো পুরে দিল মুখে।

আমি নারাণকে শুধোলাম, এখানে শিকারী এসেছে?

নারাণ বলল, শিকারী কোথায়? বাবু, দু বছর মাংস খাইনি। শিকার হলে পাঁচ ক্রোশ দৌড়ে যাব মাংসের জন্যে। যদি শিকার হয় তো ভালোই।

বিষেণ সিং সর্দারজী কাছেই কোথাও ছিল। তাড়াতাড়ি লুঙি এঁটে নাগড়া পায় এল, বলল, ক্যা বাত বাবু?

আমি বললাম, তুমি একটু থেকো বিষেণ সিং। আমি জীপটা নিয়ে একটু ঘুরে আসছি। যাব আর আসব।

জীপটার কারবরেটারে ময়লা এসেছে। স্টার্ট নিতে একটু গাঁই-গুঁই করল। তারপর স্টার্ট নিতেই চড়াইটা উঠে এগিয়ে গেলাম। কোনো ঠিকাদার গত বছরে পাহাড়ের মাথায় যাওয়ার একটা পথ বানিয়েছিল কাঠ নামাবার জন্যে। এখন পথটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘাস পাতা ঝোপ-ঝাড় গজিয়েছে পথের মাঝে। কিন্তু জীপ চলে যায়।

ঐ পথ ধরে ফারস্ট্ গিয়ারে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে।

পাহাড়ের উপরে জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা—শুধুই মই গাছ আর কুসুম গাছ। মনে হয়, উপরে মালভূমির মতো আছে, অনেকখানি জায়গা সমতল। কাল বিকেলে কক্ষ্ুকে ঐ দিক থেকেই আসতে দেখেছিলাম। কে ওখানে রাইফেল দিয়ে গুলি করল তা জানবার কৌতূহলও কম হলো না।

পাহাড়ের মাঝমাঝি উঠেছি, এমন সময় আবার একবার গুলির আওয়াজ শুনলাম। এবারে টিক্-চুঁই-ই-ই-ই নয় ঢপ্ করে আওয়াজটা হলো। গভীর জঙ্গলের মধ্যে রাইফেল ছুঁড়েছে এবার। আওয়াজটা দম বন্ধ হয়ে বেরুল পাছ-পালার গভীর থেকে।

জীপটা দাঁড় করিয়ে, জীপ থেকে নেমে যেদিক থেকে আওয়াজটা

হলো, সে দিকে চেয়ে রইলাম, জীপের আড়ালে শরীরটাকে লুকিয়ে রেখে।

হঠাৎ সামনের জঙ্গলে কাউকে দৌড়ে আসতে শুনলাম। ডাল-পাতা আন্দোলিত হচ্ছিল, আওয়াজটা এগিয়ে আসছিল, জীপের দিকে।

তাড়াতাড়ি জীপ ছেড়ে সরে গিয়ে একটা বড় শিমূল গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। লুকিয়ে পড়তে-পড়তে কোমর থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে, সেফ্‌টি ক্যাচের উপরে আঙ্‌ুলটা ছুঁইয়ে রাখলাম।

আওয়াজটা আরো কাছে এল। পরক্ষণেই দেখি, কম্ফ্‌ু জঙ্গল ফুটে বেরুল। মুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট।

ও জীপের কাছে এসে জীপের আরোহীর সন্ধান করল। কাউকে দেখতে না পেয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল। কোনদিকে দৌড়বে এবার তা বুঝতে পারলো না।

আমি ওকে চাপা গলায় ডাকলাম, কম্ফ্‌ু।

কম্ফ্‌ু আমাকে দেখতে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বলল, আলো-বাপ্পালো! তুমি! তাই বলো! আমি ভাবলাম, কার-না-কার জীপ বুঝি?

আমি বললাম, গুলি হলো কিসের? কে গুলি করল?

—তা দিয়ে তোমার কি হবে বাবু? মাংস খাবে তো এসো।

আমি বললাম, জেলে যাবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি?

কম্ফ্‌ু বলল, প্রাণে বাঁচলে, তারপর সব। কতদিন মাংস খাইনি, তা জানো?

আমি ওর পিছনে পিছনে জংগলের ভিতরে গেলাম। অনেকখানি ভিতরে গিয়ে, কম্ফ্‌ু দু'হাত দিয়ে ঝোপ-ঝাড় ফাঁক করে দেখালো।

দেখি একটা অতিকায় শম্বর ঘাড় নেতিয়ে পড়ে আছে। শিং দুটি প্রকাণ্ড। এতবড় শিঙাল খুব কম দেখেছি।

কম্ফ্‌ু বলল, এবার চলো।

ক্যাম্পে এসে খবর দিল কম্ফ্‌ু। তারপর নারাণকে বলল, তুই ক্যাম্পে খবর দে। আজ ভোজ।

নারাণ গেরুয়া গামছা পরে, এক হাতে খুন্তী নিয়ে বেরিয়ে এসে ছিল। মাংসের কথায় ওর মুখ-চোখের ভাব এমন হলো যে, তা না দেখলে বোঝানো যাবে না। মানুষ যে কত বুভুক্ষু, কত মাংস-লোলুপ হতে পারে তা যারা নারাণদের মতো হতভাগা লোকদের স্বচক্ষে না দেখেছে তারা কখনও জানবে না। বড় কষ্ট হয় ওদের দেখলে।

নারাণ শুধোলো, কে মারল রে কম্ফ্?

কম্ফ্ বলল, তাতে তোর দরকার কি রে শালা?

নারাণ বলল, ঠিক, ঠিক। আমার একটু মাংস পেলেই চলবে। আর কিছু জানতে চাই না আমি।

নারাণ কম্ফুর বউ আর চন্দনীকে রান্নার ভার দিয়ে নিমেষের মধ্যে জঙ্গলের পাকদণ্ডী দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্প্‌কাটা কুলিদের খবর দেবে।

আজ কাজ বন্ধ। সকলে মিলে শম্বরটাকে কাটাকুটি করবে, মাংস ভাগ করবে। আজ বড় খুশীর দিন ওদের। বেলা হয়েছে বেশ। একটা মন্থর, আলস্য-ছড়ানো হাওয়া উঠেছে বনে-বনে। বাঁশে-বাঁশে কট্‌কটি আওয়াজ। ঝরা পাতার উসখুসানি। মৌটুসী পাখির ফিস্‌ফিস্ আধো-আধো ডাক। হাওয়ায় গাছ-গাছালির পাতা দুলছে, রোদ কাঁপছে, পাতাগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে দিকে দিকে। হলুদ বসন্ত ডাকছে নালার গভীর থেকে। একটা বাদামী রঙের বড় লেজঝোলা কুম্ভাটুয়া নালার ঐপাড়ে জলের পাশে পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার গায়ে রোদ পড়ে এমন ঝকঝক করছে যে ওদিকে তাকালে চোখ ধেঁধে যায়। উজানে নালার মধ্যে একটা বড় গর্ত আছে। বড়-বড় কালো-কালো পাথর সেখানে। একটা দহর মতো। পাহাড়ী পুঁটির ঝাঁক, যেখানে চন্দনী একটু আগে চান করতে গেছিল। কোথা থেকে খোঁজ পেয়ে একটা ঘন নীল আর লালে মেশা ছোট মাছরাঙা ছোঁ মেরে মেরে মাছ খাচ্ছে সেখানে। সামনের পথের উপরে একটা ফড়িং-খাওয়া পাখি লেজ দুলিয়ে উড়ে উড়ে খয়েরী রঙা ফড়িংগুলোকে কপাকপ্ গিলে খাচ্ছে।

কানের মধ্যে এতসব সুন্দর, সংযত সুসমঞ্জস শব্দ, চোখের তারায় এত রঙের প্রতিফলন, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রগাঢ় প্রশান্তি, ভালোলাগা, সব মিলিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে আমারও।

চন্দনী এসে সামনে বসল হাঁটু গেড়ে। ভারী সুন্দর করে হাঁটু গেড়ে জোড়া গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসে এই বনের মেয়েরা। এত নমনীয় ওদের বসার ভঙ্গিটি, যে দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

চন্দনী মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, কি করবে তুমি আমাকে নিয়ে? ঠিক করলে?

আমি কিছু বললাম না। অনেকক্ষণ ওর ফিঙের মতো কালো চোখে তাকিয়ে রইলাম।

হেসে ফেলে, অনেক পরে বললাম, চন্দ্রকান্তটা বড় বোকা। তোমার মতো মেয়েকে ছেড়ে, কেউ হাতী মেরে ফেরারী হয়?

তারপর বললাম, তোমার দিকে সে ভালো করে কি চেয়ে দেখেনি কখনও!

চন্দনী হাসল। বলল, চাইলেই কি? সকলের চোখ কি ভগবান সমান দেন? সকলেরই তো চোখ আছে। সকলেই তো চোখ মেলে দেখে। কিন্তু চোখ মেললেই কি সকলে সব কিছু দেখতে পায়?

তারপর কথা ঘুরিয়ে ও বলল, আমার মন বড় খারাপ হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার জন্যে আরো কি না কি হবে এখানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা বলব? শুনবে?

—বল। কি কথা?

—চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায়? আমি বললাম!

—যেখানে হয়। তোমার যেখানে ইচ্ছে। যদি মনে করো আমি তোমার বোঝা, আমাকে যেখান থেকে এনেছিলে সেখানেই ফেলে দিয়ে এসো। আমার যা হয় হবে। আমার জন্যে এতজনের বিপদ হোক তা আমি চাই না। সকলে বলছে যে ঐ গাল-পোড়া বেনে নাকি ভারী ইতর। ও করতে পারে না এমন কাজ নেই।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

—বল। চন্দনী বলল।

—এত লোক থাকতে আমাকেই তুমি ডেকে পাঠালে কেন?

চন্দনী চমকে উঠল।

বলল, জানি না।

তারপর বলল, সব প্রশ্নের জবাব হয় না। এ প্রশ্ন তুমি আমাকে শুধিয়ো না। আমি সত্যিই জানি না।

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

ও চোখ নামিয়ে নিল।

তারপর উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পরই আমি বেরোলাম। বিষেণ সিং সন্ধ্যে অবধি থাকবে। কেন জানিনা, এই লম্বা চওড়া দাড়ি গোঁফওয়ালা সর্দারজীর উপরে আমার খুব আস্থা। আজ বলে নয়। বহুদিন হলো। নেশা নেই কোনো লোকটার। এক চায়ের নেশা ছাড়া। ট্রাকের স্টিয়ারিং-এর সামনে গুরু-গোবিন্দর ছবি। অসমসাহসী এই বিষেণ সিং। বহুবার তার সাহসের পরীক্ষা নিয়েছি আমি। কখনও কোনো পরীক্ষাতে ফেল তো করেইনি, পরীক্ষকের চেয়ে যে পরীক্ষার্থীর সাহস বেশী এ-কথাই প্রমাণ করেছে সে। বার বার।

যদিও ও বিষয়ে কোনো কথা বললাম না, কিন্তু আমি জানি যে ওর ট্রাকের ড্রাইভিং সীটের নীচে একটা লাইসেন্সবিহীন দোনলা বন্দুক আছে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ও কোলকাতা থেকে জোগাড় করেছিল। গুলিও ওর কাছে আছে। তাও আমি জানি। মাঝে-মাঝে হরিণ শম্বর মেরে জালকাঠের পাহাড়ের নীচে ঢুকিয়ে নিয়ে সে চেক-পোষ্ট পার হয়ে যায় ঠিকই। বিষেণ সিং-এর স্ত্রী প্রীতম্ বড় ভালো শাম্মী কাবাব বানায় হরিণের। এই একটা নেশা বা অপরাধ বিষেণ সিং-এর।

বিষেণ সিং বলল, আপ্ ইতামিনান্‌সে যাইয়ে। যবতক্ আপ নেহি লোটিয়েগা, ম্যায় দেখভাল্ করংগা হিঁয়া।

সকালে যে লোকটাকে নালার কাছে দেখেছিলাম, সেই নালার দিকেই আবার চললাম আমি। কেন জানি না, আমার সিক্সথ্ সেন্স বলছিল যে, ঐদিকেই চন্দ্রকান্ত আছেন কোথাও।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, চন্দ্রকান্তর অন্তর্ধান শুধুমাত্র হাতী মারার অপরাধে ধরা পড়ার ভয়েই নয়। ছবি নায়েকের চন্দনীকে নিয়ে যেতে আসা, সেটাও নিছক মদমত্ত কাম নয়। এই সমস্ত ব্যাপারের পিছনে আরও গভীরতর কোনো ব্যাপার হয়ত আছে, যা সম্বন্ধে আমি অবহিত নই। এমন কি কফ্ফুর কথাবার্তাও একজন সাধারণ বুনো বস্তির মতো নয়। ওর প্রতিটি কথার পেছনে হেঁয়ালি আছে। ও যেন নিজের কথা বলছে না, অন্য কারো কথা বলছে।

সকালে লোকটাকে যেখানে বাঁকের মুখে হারিয়ে যেতে দেখেছিলাম, সেইখানে পৌঁছে অত্যন্ত সাবধানে এগোতে থাকলাম। বন এখানে বড় গভীর। দুপুরবেলাও প্রায় অন্ধকার। সাহাজ, মিটকুনিয়া, তেঁত্‌রা, গাম্‌হারি, শিশু এসব গাছই এখানে বেশী। বুড়ো জংলী অশ্বত্থ ও বটও আছে। মাঝে মাঝে শালি বাঁশ। খুব সাবধানে পথ চলতে হয়। আমও আছে কিছু। মহীরুহ।

একটা অস্পষ্ট পাকদণ্ডীর মতো পথের রেখা পড়েছে চৈত্রের শুকিয়ে ওঠা লাল ঘাসে। একটু এগিয়ে গিয়েই নালাটাকে আবার পেলাম। অপূর্ব এক দৃশ্য দেখলাম এখানে। বোধহয় পাঁচ হাজার প্রজাপতি একসঙ্গে উড়ছে। উড়ছে আর বসছে। এক-এঞ্জিন বোমারু প্লেনের মতো গুন্‌গুন্ শব্দ উঠছে জায়গাটা থেকে। সবুজ বনে হলুদ প্রজাপতির ঝাঁক হলুদ আগুন জেলে দিয়েছে। এখানে নালায় জল বেশী নেই। ভেজা বালির উপর সামান্য জল। প্রজাপতিগুলো জল খাচ্ছে সেখানে। বালির উপর উড়ে উড়ে উঠছে আর বসছে। হঠাৎ চোখ পড়ল, বালির উপরে প্রজাপতিদের প্রায় পাশেই একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ জলে এসেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। তারপর আবার এগোলাম।

এদিকটায় বড় বড় পাথর। কালো, সাদা নানারকম। কোনো ফেরারী লোকের আত্মগোপন করে থাকার আদর্শ জায়গা।

বড় বড় পাথরগুলো নজর করতে করতে চলেছি, এমন সময় আমার সামনে একটা নুড়ি এসে পড়ল। কোনো গাছ থেকে নুড়িটা ছুঁড়ল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা কোমরে চলে গেল পিস্তলের কাছে। এমন সময় কে যেন হেসে উঠল গাছের উপর থেকে।

উপরে তাকিয়ে দেখি, একটা বহু পুরোনো আমগাছ। উপরটা এত ঝাঁকড়া যে নজর চলে না। আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি, একটা গাছের আড়াল নিয়ে, এমন সময় সেই গাছের গুঁড়ি বেয়ে ঝুপ্ করে কি একটা পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম, দড়ির সিঁড়ি একটা।

গাছের উপরের অন্ধকার থেকে একজন লোক দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলো।

আমি যেমন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলাম পিস্তলের বাঁটে হাত দিয়ে তেমনই দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখি চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্ত হাসছিলেন। বললেন, আসুন, আসুন। আমাকে না দেখে যখন থাকতেই পারলেন না, তখন আপনাকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক মনে করলাম না।

উপরে উঠে দেখি গাছের গভীরে বিরাট এক মাচা। শুধু তাই নয়, সেই গাছ থেকে অন্যান্য গাছে যাওয়ার জন্যে ব্রিজ বানানো হয়েছে। প্রায় পাঁচশো মিটার জায়গা ছেয়ে মাচার পর মাচা।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, জিম করবেটের 'ট্রি-টপস' বইটা পড়ে এই আইডিয়া পাই। যদি কেউ এই গাছের হদিস পায়ও, তাহলে পাঁচশো গজ দূরে যে-কোনো দিকে গাছে-গাছে চলে যাবো নেপালী ইঁদুরের মতো। তারপর নেমে পড়ব যেদিকে খুশী! ঝুপ্ করে!

বললাম, যেরকম মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসেছেন, আপনার মতলবটা কি? জঙ্গলে যত হাতী আছে, সব সাবাড় করবেন নাকি?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, লবঙ্গীতে এখন হাতী নেই-ই।

চন্দ্রকান্ত আমাকে শালপাতায় করে একটু মধু খেতে দিলেন।

মধুটা খাচ্ছি, এমন সময় চন্দ্রকান্ত বললেন, চন্দনী এখানে এলো কেন?

আমি বললাম, চন্দনীর অপরাধটা কোথায়? বেচারীকে যে অবস্থায় দেখলাম, তা দেখলে আপনি যে কি করতেন জানি না।

—কি অবস্থা? চন্দ্রকান্ত শুধোলেন।

আমি বললাম, আপনি কি জানেন টিকড়পাড়াতে দারিয়ানী হয়ে পেট চালাচ্ছিল ও।

চন্দ্রকান্ত নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললেন, হুঁ, শুনেছি তা।

তারপর হেসে বললেন, মেয়েদের কি সুবিধা না? চেহারা মোটামুটি সুন্দর হলে পেট চালানোটা একটা কোনো ব্যাপারই নয়।

আমি লোকটার নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

বেশ অনেকক্ষণ পর শালপাতাটার দোনাটা নীচে ফেলতে যাবো, অমনি চন্দ্রকান্ত আমার হাত থেকে দোনাটা নিয়ে নিলেন। বললেন, আমায় দিন। নীচে ফেললে চোখে পড়বে। আপনি শিকারী লোক হয়ে এই ভুল করতে যাচ্ছিলেন কি করে?

আমি ভাবছিলাম সবই ভুল। চন্দ্রকান্তর কাছে আসাও ভুল হয়েছে আমার।

একটু পরে বললাম, আশ্চর্য! চন্দনী আপনার বিবাহিতা স্ত্রী, অথচ আপনি এরকমভাবে ব্যাপারটাকে দেখবেন, ভাবা যায় না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, স্ত্রীলোক কখনও কাউকে ভালোবাসেনা। কর্তৃত্ব করতে চায় ওরা পুরুষের উপর। চন্দনী জেনেশুনে ভুল লোককে বিয়ে করেছিল। ও আমাকে খোঁটায় বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, ওর ঘটিবাটির মতো সম্পত্তি বানাতে চেয়েছিল আমায়।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমি ওকে কখনও ভালোবাসিনি। ওকে কেন? কোনো স্ত্রীলোককেই কখনও ভালোবাসিনি আমি। চন্দনী আমার জীবনের পরিপন্থী। কখনোই পরিপূরক হয়নি। অবশ্য একথা অস্বীকার করিনা যে,

আমার জীবনের পরিপূরক হওয়া সহজ নয়।

আমি চুপ করে রইলাম।

বললাম, চন্দনীকে একবার আপনার কাছে নিয়ে আসব?

চন্দ্রকান্তর চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল।

মাথা নেড়ে বললেন, না। একদম না।

—তাহলে, আমি ওকে নিয়ে কি করব?

অসহায় গলায় আমি বললাম।

চন্দ্রকান্ত হেসে ফেললেন।

বললেন, যুগ-যুগান্ত ধরে পুরুষরা মেয়েদের নিয়ে যা করেছে তাই-ই করুন। আপনি তো আবার নরম মনের লোক। আপনি চান তো বিয়ে করেও ফেলতে পারেন। না চান তো, যেখান থেকে তুলে এনেছিলেন, সেখানে ছেড়ে দিয়ে আসুন। আমার বলার বা করার কিছুই নেই।

আমি চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, ও কিন্তু এখনও আপনাকে ভালোবাসে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, এক কথা বারবার না বলাই ভালো। মেয়েদের ভালোবাসার স্বরূপটা আশ্চর্য। ওদের জলের মতো চরিত্র। যখন যার ঘরে থাকে, যার বুকে, তার দিকে বড় সহজে গড়িয়ে যায় ওরা। ওরা নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের নিরাপত্তাকেই ভালোবাসে। শালাবাবু, দয়া করে চন্দনীর ভালোবাসার কথা আমাকে আর বলবেন না।

আমি বললাম, একদিনও কি ওকে নিয়ে এলে সত্যিই রাগ করবেন আপনি? ভেবে বলুন।

চন্দ্রকান্ত বললেন, না-ভেবেই বলছি, যদি আনেন, তাহলে এই গাছে বসেই গুলি করে মারব ওকে।

তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন:

"পাকলা আম্র সুরতি
তুহি চম্পাফুল মহি মালতী

রাতিরে হেব্ব পীরতি, সজনী লো॥
কঁইথমূলে দোকান,
নুয়া দারিয়ানী বিকুছি পান।
পানরে না লাগে চুন।
কঁইথমূলে ম বাসা
বেল বুড়ি গন্ধে, নেবু পয়সা
না ভাঙ্গ মোর আশা, সজনী লো।”

বলেই, হাসতে লাগলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

বেলা পড়ে আসছিল। বিষেণ সিং আমি না-যাওয়া পর্যন্ত আটকে থাকবে। তাই আমি বললাম, আজকে যাই।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আরেকদিন আসবেন। তবে খুব সাবধানে। কেউ যেন পিছু না নেয়। সম্ভব হলে রাতে আসবেন। একটু দেখে শুনে। নালায় একটা বড় বাঘ রোজ জল খেতে আসে সন্ধ্যের পর।

আমি গাছে উঠে যেতেই কাছির সিঁড়িটা তুলে নিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। এবারে সিঁড়িটা আবার ফেলে দিলেন।

সিঁড়িতে পা দিয়ে আমি বললাম, শরীর কেমন আছে এখন?

চন্দ্রকান্ত বললেন, প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। দেখছেন না কেমন হৃষ্টপুষ্ট হয়েছি। সবই কম্ফুর দয়া। যা কোনো বিলেত ফেরৎ ডাক্তারে পারলো না, সেই হাঁপানী প্রায় নিরাময় করে এনেছে ওর জড়ি-বুটি দিয়ে।

তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললেন, কম্ফুর জন্যে আমি সব করতে পারি।

আমি বললাম, যেমন সকালবেলা শম্বরটা মারলেন।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন।

বললেন, শুধু কম্ফুর জন্যে নয়।

তারপর বললেন, থার্ডক্লাস হাত হয়ে গেছে। প্রথম দুটো গুলিই মিস্ করলাম। ভাবা যায় না!

আমি নেমে যেতেই সিঁড়িটা আবার উঠে গেল সড় সড় করে। কে বুঝবে যে, ঘন পাতার আড়ালে অমন আরামে থাকার মাচা আছে ?

ছবি নায়েক যে সেদিন রাতে চন্দনীর জন্যে এসেছিল ক্যাম্পে এ কথা আমি তাঁকে বলিনি। কিন্তু মনে হলো, চন্দ্রকান্ত সব খোঁজই রাখেন।

নালায় নেমে আস্তে আস্তে এসে রাস্তাটায় উঠলাম। বেলা পড়ে গেছে। একটু পরে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। গাছ-গাছালির ছায়াও এখন আর দেখা যায় না। চারিদিকে সায়াহ্নকার ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ সামনে রাস্তার উপরে চোখ পড়তেই দেখি বড় একটা ময়ূর পঞ্চাশ গজ দূরে আমার দিকে পিছন ফিরে পথের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ময়ূরটাকে লক্ষ্য করছি, ঠিক এমন সময় ময়ূরটার পিছনের ও আমার সামনের জঙ্গল থেকে একটা চিতাবাঘ পথের বাঁদিক থেকে বেরিয়ে এক লাফে ময়ূরটাকে ধরল—ময়ূরটা একবার কেঁয়া করে ডেকে উঠেই থেমে গেল।

চিতাটা ময়ূরের গলা কামড়ে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চিতাটাকে জঙ্গলের গভীরে চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে আবার আস্তে আস্তে এগোলাম।

সন্ধ্যের পর বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা ভাব হয়। দূর থেকে ক্যাম্পের সামনের আগুন দেখা গেল। বিষেণ সিং কাঠের গুঁড়ির উপর বসে চা খাচ্ছিল। আমাকে দেখে আশ্বস্ত হলো। বলল, আপহিকা ইন্তেজারীমে থা। আব্ ম্যয় চলে।

চা খেয়ে, বিষেণ সিং হেল্পার অশোককুমারকে নিয়ে বন-পাহাড় কাঁপিয়ে তার মার্সিডিস্ স্টার্ট করে জঙ্গলের পথ আলোয় উদ্ভাসিত করে চলে গেল। অনেকক্ষণ অবধি পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে ট্রাকের শক্তিশালী এঞ্জিনের গোঙানী শোনা গেল। তারপর একসময় গোঙানীটা মিলিয়ে গেল। ঝিঁঝির ডাক সমস্ত পরিবেশকে মুড়ে দিয়ে চাঁদের আলোয় মাখামাখি করে রাতকে হাত ধরে বন-পাহাড়ে খেলাতে নামাল। লজ্জাবতী লতার মতো পাতাওয়ালা মানুষের

মাথা-সমান দস্তারী গাছগুলোর পাতায় পাতায় চাঁদ পড়ে পাতাগুলো দেখতে দেখতে রূপোঝুরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখতে পেয়েই চন্দনী কাছে এলো। এ এক নতুন অনুভূতি আমার জীবনে। ও যদি শহুরে শিক্ষিত মেয়ে হতো, তাহলে আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক হতো। সে যেমন আমাকে খুশী করার চেষ্টা করত, আমিও তাকে। তাহলে দুজনের মনের মধ্যেই সব সময় একটা টেনসান থাকত, দুজনে দুজনকে খুশী করতে পারছি কি পারছি না এটা জানার জন্যে। কিন্তু ও যে আমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করে না, শুধুই আমার আশ্রয় চায়, শুধু কাছে থাকতে চায়, শুধু নীরবে আকুতি জানায় যাতে আমি ওকে ছেড়ে না যাই। আশ্রম হরিণীর মতো ও আমার পায়ে পায়ে ঘোরে, বোবা চোখে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানায়। ওর ভাষা আমার ভাষায় কত তফাৎ, কত তফাৎ সবকিছুতে। কিন্তু ওর অন্তরের নম্র নারীসুলভ ঐশ্বর্যে ও আন্তরিকতায় ও আমাকে এই চাঁদের আলো দিগন্ত বিস্তৃত বনানীকে যেভাবে আপ্লুত করে, তেমনভাবে আপ্লুত করে রাখে।

হঠাৎই নিজের কাছে আমি বড় দামী হয়ে উঠেছি। আমা-হেন লোকেরও যে এত দাম, সে-ও যে কারো কাছ থেকে যত্ন, ভালোবাসা, প্রীতি পেতে পারে, তার সুখই যে অন্যজনের সুখ হতে পারে, এসব কথা এক সপ্তাহ আগেও আমার বিশ্বাস হতো না। এই হঠাৎ, দুর্ঘটনাপ্রসূত, ঈশ্বরপ্রেরিত প্রাপ্তি আমাকে বড় অভিভূত করে ফেলেছে।

নারাণ চা করছিল। চন্দনী দৌড়ে গেল সে চা আনতে। আমি ইতিমধ্যে জুতো-জামাকাপড় ছেড়ে, পায়জামা পাঞ্জাবী চটি পরে ফেললাম। এণ্ডীর চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। তারপর কাটা কাঠের গুঁড়িতে এসে বসলাম। উল্টোদিকে মুখ করে। আগুনটা চাঁদের আলোর রাতের শোভাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। কাল থেকে আগুনটাকে ক্যাম্পের পিছনে করতে বলব।

চন্দ্রকান্ত যে কবিতাটি বলেছিলেন তার কথা ভাবছিলাম।

কবিতাটির মানে হচ্ছে, পাকা আমের মতো শরীর তোমার। তুমি চাঁপাফুল আর আমি মালতী ফুল। রাতের বেলা প্রেম হবে গো, আহা! কদবেল গাছের তলায় দোকান। সেই দোকানে বসে নবীন বেশ্যা পান বিক্রী করছে। দেখো, পানে চুন লাগিও না। আমার বাড়িও কদবেল গাছের তলায়। এখন পান্ দাও, সূর্য ডুবে গেলে পানের পয়সা পাবে। আমায় নিরাশ কোরো না যেন সজনী।

আমার চোখের সামনে চন্দনী ঘুরছিল, আর কেবলি আমার চন্দ্রকান্তর শীতল নিষ্ঠুরতার কথা মনে হচ্ছিল। মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারে ভেবে পাচ্ছিলাম না।

চন্দনী চায়ের গ্লাস এনে আমাকে দিলো।

আজ ও বিশেষ করে সেজেছে। পরিষ্কার সাদা শাড়ি পড়েছে একটা। মাথায় যুঁই ফুল গুজেছে, সাদা। ওর কালো রঙে, সাদা শাড়ি ও সাদা ফুল চাঁদের আলোয় ভারী ভালো দেখাচ্ছে।

চন্দনী আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার চা খাওয়া দেখছিল। কোমরের সামনে একহাতে অন্য হাত ধরে দাঁড়াবার ভঙ্গীটি ওদের এত মিষ্টি!

চা খাওয়া হয়ে গেলে গ্লাসটা হাতে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে চন্দনী বলল, খোঁজ পেলে?

প্রায় সত্যি কথা বলে ফেলেছিলাম! কোনোক্রমে সামলে নিয়ে বললাম, না। বোধহয় ঐ জঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে?

এই প্রশ্নর মধ্যে খুশী ছিল, না অখুশী বুঝলাম না। ওকে উদাসীন দেখলাম।

আমি বললাম, কি করে বলব? এ জঙ্গলে তো হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে না। দেখি আরো ক'দিন!

—দেখে লাভ কি? ও বলল।

তারপর বসল, লাভ নেই কোনো। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায় ?

আমি বললাম।

ও হাসল। বলল, তুমি যেখানে যাবে, যেখানে তোমার খুশী।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, কম্ফু ফেরেনি এখনও ?

চন্দনী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো জবাব দিলো না তারপর বলল, না। এখনও নাকি শম্বরটার মাংস ভাগ-বাটোয়ারা শেষ হয়নি। কত দূর দূর থেকে যে লোকে মাংস নিতে এসেছে কি বলব! নারাণদা গল্প করছিল।

তারপরই বলল, আচ্ছা! ছবি নায়েক যদি বনবাবুদের খবর দেয়? কি হবে?

আমি বললাম, অনেক কিছুই হতে পারে।

এমন সময় কম্ফু ফিরল। জামা-কাপড় রক্তে মাখা।

বলল, লোকগুলো একেবারে রক্তখিয়া। মাংস-মাংস করে কী কাড়াকাড়ি। বলেই, চান করতে চলে গেল নালায়।

যাওয়ার সময় বলল, আজ সারাদিন আমার রুগীর দেখাশোনা হলো না। খাওয়াও হলো না সারাদিন।

আমি বললাম, এখন ভাল করে শম্বরের মাংস খাও।

কম্ফু চেঁচিয়ে নারাণকে বলল, তোদের ভাল রান্নার মাংস আমাকে একটু চাখতে দিস নারাণ। আমাদের ঘরে তেল নেই। আমরা ঝল্‌সে বা সেদ্ধ করে খাব। বউ যা রাঁধবে।

চন্দনীকে শুধোলাম, রত্নাকরকে দেখছি না। ও ফেরেনি না কি?

চন্দনী বলল, না। বিষেণ দাদা বলছিল, ও নাকি বনতলায় গেছে, ক্যাপ্‌ থেকে সাইকেল নিয়ে।

—বনতলা কেন?

চন্দনী বলল, তা তো জানি না।

কম্ফু উবু হয়ে বসে বলদটার পায়ের স্প্লিন্টটা ঠিক করছিল।

আমিও গিয়ে ওর পাশে উবু হয়ে বসলাম। যদিও চাঁদ আজ সন্ধ্যা থেকেই বেশ জোর, তবু ও মশাল জ্বেলেছে একটা। মশালের

আলোটা ওর রোদে-পোড়া তামাটে মুখে, কাঁচা-পাকা চুলে পড়ে মুখটাকে, চুলগুলোকে এক সোনালি আভা দিয়েছে।

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম চারদিক দেখে নিয়ে, চন্দ্রকান্তর হাঁপানী সারালে কি করে কম্ফু?

কম্ফু হঠাৎ মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকাল।

তারপর বলল, তুমি গেছিলে বুঝি? দেখা হলো? নিজেই খুঁজে পেলে?

—ঠিক নিজে নয়। তবে প্রায়।

বললাম, কি দিয়ে সারালে বল না?

ও বলল, বলে কি লাভ? তুমি কি বললে বুঝবে? তবুও শোনো। পাল্‌ধুয়া গাছের ছাল কেটে, তার সঙ্গে আরও অনেক জড়ি বুটি দিয়ে বাবুর জন্যে একটা বিশেষ ওষুধ বানিয়ে ছিলাম।

—পাল্‌ধুয়া গাছ কোনটা? আমি বললাম। চিনি না তো?

কম্ফু হাসল। বলল, তুমি কি সব গাছ চেনো? বড় গাছ হয়ত চেনো কিছু কিছু। লতাপাতা কিছুই চেনো না। আমি এই নিয়েই জীবন কাটালাম। চুলগুলো কি এমনিই পাকল?

—তবে দুঃখ কি জানো? গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। যদি কেউ আমার পিছনে থাকত তবে আমি কর্কট রোগ সারাবার ধন্বন্তরী ওষুধ বানাতাম। বাবুরা বলে, আজকাল তোমাদের বড় বড় গাঁ-গঞ্জে নাকি অনেক লোক মরে এই রোগে।

আমি বললাম, হুঁ। ক্যানসারই তো এখন চিন্তা।

—সেটা কি জানোয়ার বাবু? কোনো সাপ কি? সেদিনও বলছিলে এর কথা।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ঐ কর্কট রোগের ইংরিজী নাম ওটা।

কম্ফু খুশী হলো। বলল, তাও তুমি একটা ইঞ্জিরী শেখালে। আরও একটা জানি।

আমি বললাম, কি?

কম্ফু বলল, ছবি ঠিকাদার আদর করে ডাকে আমাদের।

অমি শুধোলাম, কি কথা?

কম্ফু গর্বিত গলায় বলল, বাস্টার্ড।

তারপরই বলল, এ কথার মানে কি গো বাবু?

আমি বললাম, সে কথা থাক। পাল্‌ধুয়া গাছের কথা বল।

ও বলল, সাদা সাদা দেখতে গাছগুলো, গোল গোল পাতা হয়। এ জঙ্গলে অনেক আছে। লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাবে।

তারপর আবার বলল, আচ্ছা আমি তোমাকে চিনিয়ে দেবো।

আমি বললাম, তা তো চেনাবে, কিন্তু সেই লোকটাকে কে চেনাবে?

—কোন লোকটাকে? কম্ফু অবাক হওয়ার ভান করে বলল।

আমি বললাম, যে লোকটা তোমাকে শম্বরটা মেরে দিয়ে গেল। সে কোন দয়ালু?

কম্ফু সাবধান হয়ে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, আমার মন ভালো নেই।

—কেন? আমি বললাম।

—রত্নাকর আজ সকাল থেকে উধাও, সাইকেল নিয়ে। ড্রাইভার সায়েব বলছিলো যে, পাঁচশো টাকা নাকি পুরস্কার দেবে। সরকারে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। তাতে রত্নাকরের কি?

কম্ফু বলল, কিছু না। ছেলেটা এই বয়সেই আমাদের থেকে অনেক বড়লোক হয়েছে তো। তাই-ই বড় লোভী।

তারপর বলল, আমার কাছে শরীরের সব অসুখের ওষুধ আছে, কিন্তু মনের অসুখের নেই। আমার বড় ভয় করে। তুমি ওকে চন্দ্রবাবুর কোনো কথা বোলো না। চন্দনীকেও না।

—চন্দনীকেও না কেন? আমি শুধোলাম।

কম্ফু বলল, চন্দ্রবাবু ওকে মন থেকে মুছে ফেলেছে। মিছিমিছি মেয়েটাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন?

আমি বললাম, ও।

তারপর বললাম, তুমি আমার কথাটা কিন্তু এড়িয়ে গেলে।

কম্ফু হাসল। বলল, চন্দ্রবাবুকে পুরোপুরি সারিয়েছি ছ'মাসে। কোনো কিছু তো নিইনি বদলে! চন্দ্রবাবুর কিছু ঋণ জমেছে আমার কাছে। ঋণটা শুধতে দাও। তাকেই শুধতে দাও।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

তারপর বললাম, বেশ! তাহলে চন্দ্রকান্তই শম্বরটা মেরে ছিল বলো?

—তা তো বটেই। তবে, ছবি নায়েককেও মারতে চায় চন্দ্রবাবু আমার জন্যে। কিন্তু ছবি নায়েকের সঙ্গে আমার হিসাব-নিকাশ। এর মধ্যে আমি কাউকে জড়াতে চাই না।

আমি বললাম, তোমার এত রাগ কেন?

কম্ফু অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, কেন তা বলব না।

—কেন? বলবে না কেন?

কম্ফু বলল, রাগ, জেদ এসব হচ্ছে কর্পূরের মতো। এগুলোকে মনের মধ্যে কৌটো-বন্দী করে না রেখে, তুমি যদি বলে ফেলো কারো কাছে, তাহলেই এরা উবে যায়।

কম্ফু তারপর লতা দিয়ে বাঁশের টুকরোটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, তোমার ঐ ভালো বাস্‌নার তামাক একটু দাও তো আমাকে।

আমি পকেট থেকে টোব্যাকো পাউচ বের করে ওকে টোব্যাকো দিলাম।

কম্ফু বাঁশটা ছেড়ে খৈনীর মতো দু হাতের তেলোয় মেরে নিয়ে জিভের নীচে দিলো। বলল, বাস্‌টা ভারী ভালো। তারপর বলল, আমার সঙ্গেই তোমার দেখা হয়নি আগে, বলদটা বড় দেরী করে ঠ্যাং ভাঙল।

তারপর বলল, দেখছি এরা তোমাকে সবাই ভালোবাসে। তুমি কি সে কথা জানো?

আমি বললাম, জানি।

তারপরই বলল, এটাও একটা বড় কথা। কেউ কাউকে ভালোবাসলেই হয় না। সেটা অন্যরও জানা দরকার। যেমন চন্দ্রকান্ত জানে না, চন্দনী এখনও ওকে ভালোবাসে। ভালোবাসা কি একরকম? এই জঙ্গলের লতার মতো কতরকম ভালোবাসা, কত রঙ, কত গন্ধ, কত গুণ, সব হরেক, হরেক।

তারপর একটু থেমে বলল, মেয়েটাকে আমি দেখছি ক'দিন হলো। ওকে তুমিও আবার দাগা দিও না যেন। চুল তো পাকল, একটু একটু বুঝি। মানুষ বাঁচতে পারে বহুদিন। আশী, নব্বুই, একশো', দুশো বছর। কিন্তু ভালোবাসা জীবনে একবার-দুবারই জোটে।

আজকে খিচুড়ি রেঁধেছিল নারাণ। খিচুড়ি আর আলুভাজা। শুকনো লংকা ভাজা আর কাঁচা পেঁয়াজ। সঙ্গে শম্বরের মাংস / কষা।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বাইরে বসে পাতার ঘরে এলাম। চন্দনী আগেই এসে শুয়েছিল। ও রোজ এক কোণায় ওর কাঁথা পেতে শোয়। কাঁথাটা এবং ওর জামা-কাপড় বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ওরা মাটিতে কাচে, এক রকমের মাটি আর লতা দিয়ে গা পরিষ্কার করে। ধুধুঁলের খোসাও ব্যবহার করে। করৌঞ্জের তেল মাখে, নিমের তেল মাখে, বুনো চাঁপাফুল দিয়ে মাথায় দেওয়ার তেল তৈরী করে।

রোজই ঐরকম করে শোয়। আমি ডাকলে, তবে আমার কাছে আসে। আমার পাশেই শোয় জড়সড় হয়ে। অসাবধানে ওর পা আমার পায়ে লেগে যায়, হাত হাতে ; বুক বুকে, কখনও ।

ঘরের মাথায় যে পাতাগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো শুকিয়ে গেছে এ-ক'দিনে। পাশের পাতাগুলোও। ঘরময় শুকনো পাতার ফাঁক-ফোক দিয়ে পরিষ্কার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। একটা কুম্ভাটুয়া পাখি নালার পাশ থেকে ডেকে চলেছে ঢাব্-ঢাব্-ঢাব্-ঢাব্। কতগুলো টি-টি পাখি পাহাড়ের উপরের মালভূমি থেকে ডাকছে। চম্‌কে চম্‌কে। ডিই-ইউ-ডু-ইট ! ডিউ-ইউ-ডু-ইট করে ডেকে ডেকে কাকে যে কোন অপরাধের কথা শুধোচ্ছে, তা ওরাই জানে। চিতল হরিণের ঝাঁক জ্যোৎস্নার বনে চিতার তাড়া খেয়ে স্বরোদের ঝালার

মতো লাফ মেরে মেরে ডাকছে টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ ; টাঁউ-টাঁউ।

নালাতে জল বওয়ার শব্দ ভেসে আসছে পাথরের উপর কুলকুল করে। একটা কুটুরে ব্যাঙ নালার পাশের পাথরের আড়াল থেকে কোঁয়া-কাঁও কোঁয়া-কাঁও করে অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল।

চন্দনী আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। ওর সরু কোমরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

ও ঐদিকে মুখ ফিরিয়েই ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, বৃষ্টি হবে।

আমি বললাম, পাগল নাকি? এখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আর দু-তিনদিন বাদেই দোল। বৃষ্টি হবে কি?

চন্দনী বলল, তুমি দেখো, হয় কিনা। ছোটবেলা থেকে দেখছি ঐ ব্যাঙটা ডাকলে বৃষ্টি হয়।

আমি বললাম, বাজী?

চন্দনী হাসল। বলল, বেশ!

আমি বললাম, কি বাজী?

—তুমিই বলো।

আমি বললাম, না তুমি বলো।

ও বলল, যদি জিতি, একটা জিনিষ চাইব তোমার কাছ থেকে, দেবে তো?

—দেবো। আমি বললাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, রত্নাকর এখনও ফেরেনি না?

—না। চন্দনী বলল। সন্ধ্যের পর কি কেউ একা সাইকেলে এই জঙ্গলে এতখানি পথ আসতে পারে? কত ভয় আছে না পথে।

আমি ওর সঙ্গে গল্প করার জন্যে বললাম, কি কি ভয়?

ও বলল, আহা! জানে না যেন।

বললাম, সব কি জানি? যেমন এই ব্যাঙ ডাকলে চাঁদনী রাতেও যে বৃষ্টি হয়, তা জানতাম না।

চন্দনী কপট রাগে বলল, সবটাতে ঠাট্টা, না? তুমি যে কত কিছু জানো আর আমি জানি না। এমন কি কিছু থাকতে পারে না

যে, আমি জানি, আর তুমি জানো না?

নারাণ খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি গান আরম্ভ করেছে:

“দয়া করো দীনবন্ধু শুভে যাউ আজদিন
কলিযুগে জগন্নাথ বিজে চক্রহস্ত
সাধিয়ে পউঠ অন্ন আপে করুছ ভবন
তুমে এ সংসারে সার আউ সব মায়া ঘর
কতাংত ডর উঠরো কহে দীন জনহীন।”

নারাণের গানে এমন এক সমর্পণ-তন্ময়তা আছে যে সে বলার নয়। নারাণ যখন তার মৃত ছেলের কথা বলে, যখন বলে, নাগসাপে তাকে কামড়ালে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে ও, তখন আমার কেবলই মনে হয় যে অপত্য স্নেহ বোধহয় প্রেমের চেয়ে অনেক গভীরতর বোধ।

হঠাৎ চন্দনী বলল, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? আমাকে ফেলে?

—হঠাৎ এ কথা কেন? আমি বললাম।

চন্দনী বলল, আমার মন বলছে, চলে যাবে।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল চন্দনী।

বাইরে হাওয়া দিয়েছে একটা জোর। বাঁশপাতা ও অন্যান্য পাতা মচ্‌মচানি তুলে গড়িয়ে যাচ্ছে পাথরের বুকে। ঝিঁঝির শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ সেই শব্দ সোচ্চার হচ্ছে।

চন্দনী হাওয়ার মতো ফিসফিস্ করে বলল, যদি চলেই যাও, আমাকে একটা জিনিস দিয়ে যাবে? একটা ভিক্ষা আছে তোমার কাছে।

বড় করুণ শোনালো ওর গলা। যেন মিনতি করে বলল ও।

আমি উঠে বসলাম। ওর মুখের দিকে মুখ নামিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই! বলো, কি তুমি চাও; কি তোমাকে দিতে পারি আমি?

চন্দনী হঠাৎ বড় উদাস গলায় বলল, তাহলে চলে যাবেই। জানতাম আমি।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না ও।

বাইরে ব্যাঙ আবার ডাকল, কোঁয়া-কাঁও। বাঁশবনে হাওয়া কট্‌কটি আওয়াজ তুলল। ঝিঁঝির একটানা ডাকের পটভূমিতে।

তারপর হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, যদি চলে যাও তবুও দিয়ে যাবে?

—কি চন্দনী? কি চাও তুমি?

চন্দনী এক মুহূর্ত দ্বিধা করল? তারপর বলল, না। এখন নয়। পরে বলব। বাজী জিতি।

আমি বললাম, এক্ষুণি বলো না।

চন্দনী বলল, বললাম না যে পরে বলব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম। বাইরে চাঁদের রাত উড়ছে। এমন রাতে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, আমার ভাগ্য আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে এলো। চন্দনীর পাশে যার আজ শুয়ে থাকার কথা, যার কথা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সে লোকটা এখন ঐ ঘন বনের মধ্যে মাচায় শুয়ে আছে কি? নাকি বন-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? চন্দনী যেভাবে আমার জীবনে এসে পড়ল, আমার ভারী ভয় করছে যে, এবার বুঝি ফেরা হলো না আর শহরে।

খুব কি খারাপ হবে এই জীবন? সৌমেনবাবুকে বললেই একটা ক্যাম্পের ম্যানেজারীর চাকরি জুটে যাবে এখানে অথবা অন্য কোনোখানে সহজেই। এই জীবনে চাহিদা নেই কোনো, তাই প্রয়োজনও কম।

অল্পতেই চলে যায়। সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, অতিথি অভ্যাগত, নেতা-নেমন্তন্ন, সামাজিক দায়-দায়িত্ব বলতে শহরে যা, বুঝি তার কিছুই নেই। ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, ট্রাম-বাসের বা মিনিবাস-ট্যাক্সির খরচাও নেই।

এমন কি খবরের কাগজও নেই। কী শান্তি!

সকালে উঠেই পরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানতে হবে না আল-জেরিয়ায় কি হয়েছে, কার্টার বা পদগোর্নি কি বলেছেন, পড়তে হবে না প্রধানমন্ত্রীদের বাণী, বিরোধী পক্ষের চর্বিত-চর্বন স্তোত্র।

কাগজে আমরা যা দেখি, যা পড়ি, যা নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি তার সঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার নিরানব্বুই ভাগেরই কোনো সম্পর্ক নেই। সেই একভাগের সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়তা ছিন্ন করে না হয় নিরানব্বুই ভাগের এক ভাগ হয়ে গিয়ে বাকি জীবনটা এদেরই সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সফলতা ব্যর্থতার মধ্যে কাটাই না কেন? গর্বিতা, পণ্ডিতমন্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা, সফিসটেকেটেড্ জলবৎ-তরলং কোনো বালিগঞ্জী সুন্দরীকে নিয়ে ঘর এ-জন্মে নাই-ই বা করলাম। তার চেয়ে, এই চাঁদ-ওড়া বনের গভীরে আমার বংশধরের বীজ প্রোথিত করি চন্দনীর নিম-করৌঞ্জের গন্ধ মাখা স্নিগ্ধ শরীরে। তার সহজ সরল আন্তরিক অন্তরে আমার অন্তর ধন্য হোক। তারপর ধুলোর মধ্যে, রোদের মধ্যে, জলের মধ্যে, শীতের মধ্যে আমার উলঙ্গ সন্তান বেড়ে উঠুক জঙ্গলের গন্ধ গায়ে মেখে, গরুর গায়ের মিষ্টি গন্ধ আর ফুলের গন্ধে মাখামাখি হয়ে। সে শক্ত হোক, সে মাটিতে অর্গুন পাতার বিছানায় জন্মাক, মাটির রসে আর তার যুবতী মায়ের নিটোল স্তনের নির্ভেজাল দুধ খেয়ে বড় হয়ে উঠুক। দেশজ হোক সে, সম্পূর্ণ ভারতীয় হোক; তাকে আমরা সেণ্ট-জেভিয়ার্স—লা মার্টিনীয়ারে না পাঠিয়েই, মেম সাহেবদের বাচ্চার মতো পোশাক না পরিয়েই, ইংরিজী কমিকস্ আর থ্রিলার না পড়িয়েই, মানুষ করে তুলি না হয়। তার অসুখ করলে বিদেশী বিদ্যায় পারদর্শী বিদেশী ডিগ্রিধারী ডাক্তারের কাছে লাইন দিয়ে না-দাঁড়িয়ে দিশী কম্ফুর হাতেই না-হয় তাকে ছেড়ে দিই। ভয়ের কি? কিসের ভয়?

ভাল না-খাওয়ার ভয়? ভাল না-পরার ভয়, কভেনানটেড অফিসার না-হওয়ার ভয়? অচিকিৎসার ভয়?

আমার দেশের কোটি কোটি লোক তো এমনি করেই বেঁচে আছে হাসি মুখে। তারা আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে, আমাদের সরকারী ও বিরোধীদলেরও বহু নেতাদের চেয়েও অনেক সৎ, অনেক খাঁটি। এরাইতো আসল ভারতবর্ষ! এরা শহুরে লোকদের চেয়ে অনেক ভাল। এদের মধ্যে বাস করে, শুধু ভঙ্গী দিয়ে নয়, ভালোবাসার

গভীরতার বোধে এদের বুঝে, এদের জেনে, এদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে, এদের ন্যায্য সম্মানের আসনে না-হয় বসাবই ওদের। এটা কি একটা বেঁচে থাকা নয়? এটা কি করার মতো কিছুই নয়?

আমার বড় সাহেবের কাজে বোম্বে গিয়ে, ফাইভ-স্টার হোটেলে থেকে, ডিনার-লাঞ্চ খেয়ে, ইংরিজীর তুবড়ি ছুটিয়ে, কিছু চাটুকারিতা করে, কিছু ঘুষ দিয়ে, কাজ জোগাড় করে এনে পিঠ-চাপড়ানি পাবার চেয়ে, চন্দনীর নরম শান্ত সমর্পণী চোখের ভালোবাসা, নারাণের নির্ভরতা, কম্ফুর বন্ধুত্বর দাম কি এতই কম? একটা ফ্রিজ বা একটা টি. ভি. দিয়ে কি মনের শান্তি কেনা যায়; পারব কিনতে? তার চেয়ে এই অভাবের জীবন অনেক ভাল। অনেক কিছু নেই এখানে, কিন্তু শান্তি আছে। নিবিড় নির্লিপ্ত শান্তি।

কিছুতেই ঘুম আসছিল না। উঠে বসলাম আমি।

চন্দনী পাশ ফিরে বলল, আমি কি তোমার বোঝা হলাম?

আমি হাসলাম। ওর খোঁপায় মৃদু চাপড় মেরে বললাম, না পাগলি; না।

চন্দনীকে যেন বিছে কামড়াল।

ও বলল, তুমি কখনও আমাকে পাগলি বলবে না।

—কেন?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

চন্দনী বলল, চন্দ্রকান্ত আমাকে পাগলি বলত। তুমি বলবে না।

আমি হেসে ফেললাম, আচ্ছা! তাই-ই হবে।

তারপর আমি বললাম, তুমি শুয়ে থাকো! আমি একটু ঘুরে আসছি!

—কোথায়? বলে চন্দনী উঠে বসল।

বললাম, চাঁদের আলোয় কেমন দেখাচ্ছে চারধার ঘুরে দেখে আসি একবার। হাঁটতে হাঁটতে ভাবা যায় অনেক কিছু। তোমাকে বুকের এত কাছে নিয়ে শুয়ে কি কোনো জোয়ান মানুষ ঘুমোতে পারে?

—আহা!

বলেই, চাপা হাসি হাসল চন্দনী।

আমি বললাম, মনে আছে, তোমাকে চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, বিড়িগড়ে সেদিন তুমি যখন আমার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়েছিলে — বলেছিলেন, "তোরা খালি ক্ষিদে পাইয়ে দিয়েই পালিয়ে যাস ; ক্ষিদে মেটাতে না পারলে ক্ষিদে জাগানোটা অন্যায়।"

চন্দনী হাসছিল ; বিছানায় উঠে বসে। ওর গ্রীবায় চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

চন্দনী বলল, যে এ-কথা বলেছিল, সে যেন কত বোঝে এ-সব। ভূতের মুখে রামনাম !

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, ছ্যাখো চন্দনী, সে তো ভূত না হয়ে ভগবানও হতে পারে। চন্দ্রকান্ত আমার তোমার বোঝাবুঝির বাইরে। তোমার সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা তার চরিত্রের একটা দিক মাত্র। সে তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ নয় চন্দনী। তুমি যে তার কাছে-কাছে কিছু দিনও ছিলে এই জানাটাই তোমার গর্বের কারণ হবে ; দেখো !

চন্দনী রেগে গিয়ে বলল, হলে হবে। কিন্তু তোমাকে তো আমি বলেছি, তুমি ওর কথা একবারও তুলবে না। যাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি, যে পথে হেঁটে এসেছি, সেদিকে পিছন ফিরে চাইতেও চাই না আমি। একবারও।

আমি বললাম, বেশ। আপাতত আমার পথের দিকে না তাকিয়ে শুয়ে থাকো লক্ষ্মী মেয়ের মতো। আমি একটু ঘুরে আসছি।

তারপর বললাম, তোমার কি ভয় করবে একা-একা ?

চন্দনী বলল, জানোয়ারের ভয় কোনোদিন করিনি। ভয় মানুষকে। তোমাদের মতো মানুষকে।

— আমি আবার কি করলাম ? বললাম আমি।

— ঐ হলো। তুমি করোনি, কিন্তু তোমার জ্ঞাতি-গুষ্ঠীরা করে।

বললাম, এসব কথা থাক। সত্যি বলো ভয় করবে কি না।

—কিসের ভয়? তুমি যাও। নারাণদাদের একটু বলে যেও।

নারাণদের ঝুপড়ির কাছে গিয়ে দেখি বলব কাকে? শম্বরের মাংস খেয়ে আজ এরা এমনই বেহুঁশ যে লুঙ্গী একদিকে, শরীর অন্যদিকে করে সব অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কম্ফুর ঝুপড়িতেও সাড়া শব্দ নেই। বাইরে শুধু চ্রিপ্ চ্রিপ্ করে ঝিঁঝি ডাকছে, নালার জল বওয়ার কুল্‌কুলানি, আর পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা ডাক।

আমি বললাম, ঘুমোও তুমি। আমি ঘুরে আসছি একটু।

এখন রাত গভীর। খাদের মধ্যে দূরের নালার পাশে ভারী জানোয়ারের চলা-ফেরার খস্ খস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। শম্বর কি নীলগাই হবে। বাইসনও হতে পারে। চাঁদের আলোয় পত্রহীন কোমল সাদা গেণ্ডুলি গাছগুলোকে সাদা মোমের মতো দেখাচ্ছে। সাদা সাদা মহুফুলগুলোকে সাদা সিল্কের রিবনের ফুল বলে মনে হচ্ছে। রাতে কুসুম, শিমুল, পলাশকে কালো কালো মনে হয়। ওদের শোভা দিনে। খাদের ওপাশে একটা খুব উঁচু পাহাড়। উটের পিঠের কুঁজের মতো তার কুঁজ চাঁদটাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। তারার মালা আকাশময়। চাঁদের রাতে ওদের প্রভা মলিন; তবুও আছে।

চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ভালো করে কথা হলো না। উনি রাতে যেতে বলেছিলেন। এমন রাতে আর দিনে তফাৎ কি?

চারিদিকে চোখ রেখে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছি। যারা বনে জঙ্গলে ছোটবেলা থেকে ঘোরে, তাদের পা ফেলার কায়দাও শিকারী জানোয়ারের মতো হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে ছায়ার মতো এগিয়ে যায় তারা। এক ছায়া থেকে অন্য ছায়ায়। ছায়ায় ছায়ায়।

একটা বাঁক নিয়েছি, নিতেই দেখি, সামনে দুজন লোক চলেছে আমার চেয়েও নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে। একজনের কাঁধে একটা দোনলা বন্দুক। চাঁদের আলোয় ব্যারেল চক্‌চক্ করছে। একটা লোক বেঁটে, চারকোনা দেখতে, অন্য লোকটা মাঝারী। শিকারির মতো জামা-কাপড় পরা। একটু ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে হাঁটছে অন্য লোকটা। ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে।

আমি একটু দাঁড়িয়ে পড়ে ভাববার চেষ্টা করলাম। ঐ লোক-গুলো কারা হতে পারে? মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি এদের।

এরা হয়তো চোরা শিকারী। কিন্তু এই বন-পাহাড়ে শিকারের অভাব নেই যে, অচেনা-অজানা লোক অন্যের সীমানায় না-বলে-কয়ে রাতে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়বে শিকার করতে।

খুব সাবধানে লোক দুটোর পিছু নিলাম আমি।

কিছুদূর গিয়েই লোক দুটো সেই নালাটার ডানদিকে মোড় নিল।

বুঝলাম ওরা চন্দ্রকান্তর ডেরার দিকে যাচ্ছে।

আমার খুব উত্তেজনা হতে লাগল। লোকগুলোর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভালো নয়। তারপর মনে হলো, কি জানি, চন্দ্রাকান্তর ব্যাপার। এরা হয়ত চন্দ্রকান্তর মিত্রই। কি কারণে তারা যে-জঙ্গলে সন্ধ্যের পর কোনো মানুষ ঝুপড়ি ছেড়ে বেরোয় না, সে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ওরা নালায় নেমে ডানদিকে যেতেই, আমিও নালায় নামলাম। ওরা তখন বাঁকের ওপাশে চলে গেছে। ওদের দেখা যাচ্ছে না।

এমন সময় অতর্কিতে নালার সামনে থেকে প্রচণ্ড জোরে বাঘ ডেকে উঠল। হয়ত বাঘ নালার গভীরে জল খাচ্ছিল। লোক দুটো মুখোমুখি পড়ে গেছে বোধহয়।

বাঘের গর্জনে সমস্ত বন-পাহাড় গম্‌গম্ করে উঠল। আকাশের তারাগুলোও কেঁপে গেল যেন। সেই গর্জনে গভীর বিরক্তি ও খবরদার্ ধ্বনিত হচ্ছিল।

পরক্ষণেই নালা বেয়ে জোরে মানুষের ছুটে আসার আওয়াজ হলো।

আমি তাড়াতাড়ি পথে উঠে ওরা যে দিক দিয়ে এসেছিল তার বিপরীত দিকের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়লাম।

লোকগুলো মূর্খ। শিকারী তো নয়ই। বাঘের সামনে পড়ে যে ভুলেও দৌড়তে নেই তাও জানে না। কিন্তু বাঘের আর আওয়াজ শোনা গেল না। শুধু লোক দুটো দৌড়ে এলো। এসে রাস্তার ওপরে

উঠে হাঁপাতে লাগল। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা লোকটা বন্দুকটাকে শিকারের পোষাক-পরা লোকটাকে দিয়ে দিয়েছিল। দিয়ে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। লোকটা নালার দিকে বন্দুকটা তাক করে দাঁড়িয়েছিল। ভাবটা, বাঘ যদি এত দূরে তাড়া করে আসেই, তবে গুলি করে ভূপাতিত করবে।

চাঁদের আলোয় ঐ শিকারের পোষাক-পরা লোকটাকে চিনতে পারলাম আমি। যে লোকটাকে চন্দ্রকান্তর মাচার কাছে সকালবেলা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিলাম, এ লোকটা সেই-ই লোক।

ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোকটার মুখের একটা পাশ চাঁদের আলোয় চক্চক্ করে উঠল। হঠাৎ তাকে চিনলাম। এ সেই গালপোড়া জানোয়ার। ছবি ঠিকাদার।

লোকটা অনেকক্ষণ পর দম নিয়ে বলল, শালা বাঘ পুষে রেখেছে। বডি গার্ড! ঠিক আছে। সব জায়গায় তো বডিগার্ড সঙ্গে যাবে না। আজ ছাড়া পেলে বলে কি চিরদিনই পাবে?

ওরা এতাবৎ যে সাবধানতা অবলম্বন করে এসেছিল এতটা পথ, বাঘের ভয়ে সেই সাবধানতার কথা ভুলে গেল। জঙ্গলে যে ফিস্-ফিস্ করে বলা কথাও বহুদূর থেকে শোনা যায় এই সত্যটা ওরা জঙ্গলের লোক হয়েও বিস্মৃত হলো।

গালপোড়া লোকটা বলল, চল্ খিটু, চন্দনীকে তুলে নিয়ে যাই ফেরার সময়।

খাকি পোষাক-পরা লোকটা বলল, না ছবিবাবু, চন্দ্রকান্তকে আগে সামলে না নিলে ও কাজ ভালো হবে না। ঝামেলা করবে লোকটা। খুবই ঝামেলা করবে।

ছবি নায়েক পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মদের বোতল বের করে চুক্চুক্ করে খেল। চাঁদের আলোয় সাদা বোতলটা চক্চক্ করে উঠল। লোকটার সমস্ত হাব ভাব, এমনকি মদ খাওয়ার ভাবটাও কেমন চোর-চোর। লোকটা সারাজীবনে বোধহয় কখনও সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি, সত্যি কথা বলেনি। এই চাঁদের আলোতেও

জানোয়ারটার চারিত্রিক শঠতা যেন প্রাঞ্জলভাবে তার পোড়া গাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে মুখ মুছে ও বলল, না চল্, আমি এক্ষুনি যাবো। দরকার হলে চন্দনীর ঐ বাবুটাকেও আজ শিক্ষা দিয়ে দেবো। শালাকে মেরে নদীর বালিতে পুঁতে দেবো।

—ছবিবাবু আস্তে। খিটুনামক অন্য লোকটা বলল।

ছবি বলল, চুপ্ কর শালা! আমি কি তোর মতো ভীতু? আমি কাউকে ভয় করি না। আমি এ তল্লাটের রাজা। থানার দারোগা, ফরেস্টার, পঞ্চায়েত সব আমার কেনা। কিসের ভয় রে আমার?

ওরা আবার সাবধান হয়ে এগোতে লাগল ফেরা পথে। কিন্তু ফেরার পথে ছবি ঠিকাদারের চামড়ার পাম্প শু পাথরে লেগে চটাস্-ফটাস্ করে শব্দ করছিল।

ওরা একটু এগোতে, আমি আবার ওদের পিছু নিলাম।

খুনোখুনী করার ইচ্ছা আমার ছিল না। করিওনি কখনও মানুষের সঙ্গে। তবে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে প্রয়োজন হলে করেছি এবং করতেও পারি। তার উপর যখন নিজের প্রাণ খোয়ানোর প্রশ্ন ওঠে বা নিজের সম্মান বা প্রিয়জনের সম্মান খোয়ানোর, তখন খুনোখুনী না করে উপায়টা কি? কিন্তু পিস্তলটা যে বালিশের তলায় রেখে এসেছি!

সামনে আরেকটা বাঁক।

ওরা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হতেই, কার রাইফেলের নল যেন আমার পিঠে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ, চুপ।

আমি ঐ অবস্থায় সাবধানে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চন্দ্রকান্ত! মুখ চোখ অস্বাভাবিক!

আমার সেই মুহূর্তে মনে হলো চন্দ্রকান্ত বুঝি আমাকে এক্ষুনি গুলি করবেন। চন্দনী এখন আমাকে আশ্রয় করেছে বলে অথবা আমি চন্দনীকে।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যে ওঁর মুখের ভাব বদলে গেল। কিন্তু ঐভাবেই চুপ করে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রইলেন উনি বেশ অনেকক্ষণ।

ছবি নায়েকদের দূরে চলে যাওয়ার সময় দিয়ে, চন্দ্রকান্ত বললেন, কার দলে আপনি।

আমার লোকটার উপর হঠাৎ বড় ঘৃণা হলো। এক ঝটকায় রাইফেলের নলটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, আপনি একটা ইডিয়ট।

আমার কাছ থেকে ঐ কথা শোনার জন্যে চন্দ্রকান্ত তৈরী ছিলেন না।

কিন্তু আমার পিঠে ঐভাবে অতক্ষণ রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রাখাতে আমি খুবই অপমানিত বোধ করেছিলাম। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।

চন্দ্রকান্ত ব্যাপারটা বুঝলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমার পিঠে হাত ছুঁইয়ে বললেন, স্যরি।

এই পরিবেশে, এই জঙ্গলে, শহরে উঠতে-বসতে শোনা নিশ্বাস-জাত এই 'স্যরি' কথাটা বড় বেমানান বলে মনে হলো।

আমি ফিসফিস করে চন্দ্রকান্তকে বললাম, ওরা বোধহয় চন্দনীর কাছে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, যাক না তাতে আমার কি ?

আমি আবার একটা ধাক্কা খেলাম।

বললাম, আপনার না হতে পারে ; আমার হয়তো কিছু।

চন্দ্রকান্ত কথা ঘুরিয়ে বললেন, ওরা যাবে না। সে সাহস ওদের নেই। আমি বলছি ; নেই। তাছাড়া গেলেও আপনার ভয় নেই, কম্ফু আছে। ও একাই একশো।

আমি বললাম, কম্ফু ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া ওকি ঐ সাপমুখো লাঠি নিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়বে।

চন্দ্রকান্ত এক অদ্ভুত হাসি হাসলেন।

তারপর বললেন, কম্ফু কখনও ঘুমোয় না।

আফিং-খাওয়া দিনে-ঘুমানো লোকগুলোর আত্মীয় হলেও, কক্ষু ওদের কেউ হয় না। ও সবসময় জেগে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর লড়তেই যদি কেউ চায়, তাকে কি বন্দুক দিয়ে ঠেকানো যায়?

আমি বললাম, চলুন আমরা ওদের পিছু নেই। ওরা আপনাকে মারতে এসেছিল আর এমনি করে ওদের ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হলো?

চন্দ্রকান্ত সে কথায় কান না দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন, চলুন, আমার ডেরায় চলুন, অনেক গল্প করা যাবে।

তারপর বললেন, সব কিছুরই সময় আছে। আপাততঃ আপনি ডাঃ ওয়াটসন হয়ে থাকুন, শার্লক হোমসের রোলটা আমাকেই দিন। কেমন?

আমি হাসলাম। বললাম, ঠিক আছে।

নালাটাতে নেমে, চন্দ্রকান্ত কয়েক পা এগিয়েই নালাটা ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে উঠলেন। উঠে একটা শর্টকাটে ভিতরে ঢুকলেন জঙ্গলের।

আমি বললাম, বাঘটা কি নালার সব জলই খেয়ে নেবে নাকি আজ রাতে? এতক্ষণ তো এক জায়গায় থাকার কথা নয়।

চন্দ্রকান্ত বললেন, বাঘটা একটা খুব বড় চিতল হরিণ মেরেছে কাল সন্ধ্যেতে। নালার মুখেই, আজ ভোজ শেষ করে তার পরে যাবে।

—ওঃ। আমি হাসলাম। বললাম, ছবি নায়েক দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে কি বলছিল জানেন?

—কি? চন্দ্রকান্ত শুধোলেন।

আমি বললাম, আপনি নাকি বাঘটা পুষে রেখেছেন বডিগার্ড হিসেবে।

চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন একথা শুনে। বললেন, ওর মতো ছুঁচোর জন্যে বেড়ালই যথেষ্ট, কুকুরেরও প্রয়োজন নেই, বাঘের মতো মহৎ ও পরাক্রমশালী জানোয়ারের কথাই ওঠে না।

আমি আর চন্দ্রকান্ত মাচার নীচে একটা বড় পাথরে বসলাম

মুখোমুখী।

বসেই, চন্দ্রকান্তকে একটু চুপ করতে বললাম।

ওখানে বসে বাঘটার কড়মড়িয়ে চিতল-হরিণের হাড় ভেঙ্গে খাওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, বাঘটা সত্যিই পোষা নাকি?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, এক বাঘ অন্য বাঘের সীমানাকে সমীহ করে। আমি আমার সীমানাতে আছি।

তারপরেই বললেন, কিছু খাবেন?

—কি আছে?

চন্দ্রকান্ত বললেন, মুড়ি আছে, গুড় আছে, মধু আছে। খাবেন?

আমি বললাম, নাঃ। অনেক খেয়েছি আজ।

তারপর বললাম, আপনার প্ল্যান কি বলুন? এই জঙ্গলে বসে কি করতে চাইছেন আপনি? হাতীটা না মারলে তো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারতেন। এমনি করে পালিয়ে পালিয়ে কতদিন কাটাবেন?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, বাকি জীবন। এখন হাতী মারার অপরাধে ফেরার, কয়েকদিন বাদে অন্য কোনো অপরাধে ফেরার। অপরাধের সংখ্যা বেড়েই যাবে একে একে—পালাতে হবে আরো গভীর জঙ্গলে। এই-ই তো মজা! একঘেয়ে নিশ্চিন্ত জীবন আমার ভালো লাগে না, জানেনই তো।

ভয় পেয়ে বললাম, ছবি নায়েককে নিয়ে কি করবেন আপনি? নিশ্চয়ই প্রাণে মারবেন না।

তারপর বললাম, প্রাণে না মেরে শিক্ষা দিলে হতো না?

—শিক্ষা দিলেও শিখছে কে? গাল পোড়া ছুঁচোর ঐ একমাত্র শিক্ষা।

আমার সত্যিই ভয় করছিল। খুনীর সাগ্‌রেদ হিসাবে আমাকেও টানাটানি না করে!

আমি বললাম, পুলিশ? যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে, কি ফাঁসী।

চন্দ্রকান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, হলে, হবে।

আমি বললাম, যাক্‌গে, হাতীটা কি করে মারলেন বলুন। কেন মারলেন? এটা কোন হাতী? সেই দাঁতালটা বিড়িগড়ের?

—না মশাই। বিড়িগড়ের দাঁতাল কি মহানদী সাঁতরে আমার পেছন পেছন এতদূরে এসেছিল। না! এ বলরামের হত্যাকারী নয়। তবে সেই হত্যাকারী শ্রেণীরই।

বলেই চন্দ্রকান্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন, আপনি এখনও প্রেমের গল্প লিখে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, কেন? প্রেমে কি আপনার ঘেন্না?

—না, তা নয়। নর-নারীর প্রেম তো থাকবেই, চিরদিনই থাকবে। তা বলছি না, তবে প্রেম বলতে আপনারা যা বোঝেন আমি তার চেয়ে অনেক গভীরতর কিছু বুঝি। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম।

আমার প্রেম এই কন্ধ্‌দের প্রতি, নারাণদের প্রতি, এ-রকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দিশী মানুষের প্রতি। এখানে ন্যাকা ডায়ালয়ের জায়গা নেই। এ প্রেম তরল নয়; সলিড। একারণেই চন্দনীর জায়গা হলো না আমার জীবনে।

তারপর বললেন, লিখে যান, চালিয়ে যান আপনারা। ভালো রোজগার হচ্ছে। কি বলুন?

একটু থেমে বললেন, পঞ্জিকা কিন্তু আপনাদের বইয়ের চেয়েও বেশী বিক্রি হয়।

আমি আড়মোড়া ভাঙলাম। কিছু বললাম না।

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, এসব খুনোখুনীর ভাবনা ভালো নয়। আপনি বরং ছবি নায়েকের বিরুদ্ধে কেস ফাইল করুন।

—কেস্? কোর্টে?

বলেই, হাসলেন চন্দ্রকান্ত।

বললেন, তাহলে আপনি ঐ হাতীটার বিরুদ্ধেও কোর্টে কেস্ ফাইল করতে বলতেন বোধহয়। অতবড় জানোয়ারের বিরুদ্ধে কেস্ কি হাইকোর্ট নিতো? হাতী কি সেন্ট্রাল সাবজেক্ট? তা হলে তো

এখন সুপ্রীম কোর্টেই ফাইল করতে হতো। আমি না-হয় দিল্লী পৌঁছে যেতাম ; কিন্তু হাতীটা ? তারপর রায় বেরোলে অতবড় হাতীটাও কি সেই ভারী রায় বয়ে আনতে পারত ?

আমি বললাম, সব কথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, হ্যাঁ। হাতীটার কথাটাই বলি। ঐ হাতীটা বুঝলেন, সমস্ত এলাকাটাকে তার পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছিল। ঘর ভাঙছিল, ধান খাচ্ছিল, মানুষ মারছিল একেবারে ঠাণ্ডা মাথায়। গরু-মোষকেও আছড়ে পায়ের তলায় ফেলে মারছিল। তার চলার পথে যা-কিছু সে পাচ্ছিল, তাকেই সে সমূলে উৎপাটিত করছিল।

চন্দ্রকান্ত একটু থামলেন। কান খাড়া করে কি যেন শুনলেন একবার।

তারপর আবার বলতে লাগলেন। সে যে কী ভয় কী বলব আপনাকে। লোকে ঘরের মধ্যে কথা কইতে ভয় পেতো, পথে বেরোতে ভয় পেতো, মাথা উঁচু করে হাঁটতে ভয় পেতো, হাতীটা প্রত্যেকটা লোকের বুকের মধ্যে ভয় একেবারে সেঁধিয়ে দিয়েছিল, সবসময় ভয়, সবসময় হাতীর ভয়ে জবুথুবু হয়ে হাত-পা-গুটিয়ে বসে থাকা। গ্রামে ধান-কাটা বন্ধ, গান-গাওয়া বন্ধ, যাত্রা বন্ধ, সব কিছু, সব সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে এসেছিল।

গ্রামের লোকগুলো বলত হাতী। কিন্তু আমি বলতাম, ওদের বুঝোতাম যে, আসলে ওদের শত্রু হাতীটা নয়। কারণ ঐ হাতীটা মরে গেলে, কি তাকে মেরে ফেললে, অন্য কোনো হাতী ওর জায়গা নিতোই। আসলে ওরা বুঝতে পারেনি যে হাতীটার ছায়া ওদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে পড়েছে। সেই ছায়ার নাম ভয়। যারা সহজে ভয় পায়, তাদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে সবসময়ই কোনো দৈত্য, দানো, জুজু অথবা এই হাতীর মতো হাতী থাকবেই থাকবে। আসল শত্রু ভয়টা, হাতীটা নয়।

আমি চুপ করে চন্দ্রালোকিত বন-পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। রাত-চরা পাখির ডাক ভেসে আসছিল পাহাড়ের উপরের মালভূমি

থেকে। শিমূলবনের নীচের শিমূলফুল খেতে আসা কোট্‌রা হরিণের ডাকের শব্দে বিমুগ্ধ হয়ে চন্দ্রকান্তের কথা শুনছিলাম।

চন্দ্রকান্ত বললেন, বুকের মধ্যে ভয় নিয়ে বাঁচাকে কি বাঁচা বলে?

তারপরই বললেন, আপনি জিম করবেটের "জাঙ্গল-লোর" বইটা পড়েছেন?

বললাম, ও বই কে পড়েনি?

—ওখানে 'চুরাইলের' যে সেই ঝড়ের বিকেলের তীক্ষ্ণ বাঁশীর ভৌতিক স্বরের কথা উনি লিখেছেন এবং সেই ভয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথাও—তাতে একজায়গায় তিনি বলেছেন, আপনার মনে আছে কি?

—কি বলেছেন? আমি বোকার মতো শুধোলাম।

—মনে নেই? চন্দ্রকান্ত বললেন। বলেছেন, যা-কিছুই বিপজ্জনক, তার প্রতিই প্রত্যেকের এক অদম্য আকর্ষণ ও কৌতূহল থাকে, এমন কি ছোট ছেলেদেরও। এক ঝড়ের বিকেলে সেই ভয় বুকে করে ভয়কে জয় করার জন্যে উনি গিয়ে বাঁশীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন। দেখলেন, ঝড়ে একটা মহীরুহ আর একটা মহীরুহর উপর পড়ে গেছিল অনেকদিন আগে। তখন দুটো গাছই শুকনো হয়ে গেছে। খুব জোরে ঝড় উঠলে সেই বড় গাছটাকে হাওয়া ঠেলে তুলত কিছুটা, পরক্ষণেই হাওয়া সরে গেলে সে আবার পড়ত এসে শুকিয়ে-যাওয়া ছোট মহীরুহর উপরে। ঐ শুকনো কাঠের সঙ্গে শুকনো কাঠের ঘর্ষণে তা থেকে তীক্ষ্ণ বাঁশীর সুরের মতো আওয়াজ উঠত, তাকেই লোকে ভয় পেতো। ভূত বলত। তাই-ই বলছিলাম, বুকের মধ্যের ভয়কে তাড়াতে পারলেই যে-কেউই দেখতে পাবে যে বেশীর ভাগ ভয়ের বাঘ মাত্রই কাগুজে বাঘ, বেশীর ভাগ ভূতই শুকনো কাঠ।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম।

চন্দ্রকান্ত বললেন, একদিন আমি সন্ধ্যের মুখে মুখে পূর্ণাকোট থেকে ফিরে আসছি টুল্বকায়। দুপুরে বেরিয়েছিলাম। অনেকখানি পথ। গ্রামের কাছাকাছি এসেছি, দেখি, হাতীটা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে

আছে। আমাকে যদি যেতে হয় তাহলে ওর পাশ কাটিয়ে যেতে হতো।

—আমি দাঁড়িয়ে আছি, ও-ও তাই। পথ ছাড়বার পাত্র আমি নই। কিন্তু আমার হাত খালি ছিল। ফোরসেভেণ্টি ডাব্‌ল-ব্যারেল্ রাইফেল্ ও গুলি রাখা ছিল কুঁড়েতে ভীমধারার পাশে। চন্দনীর জিম্মায়।

তারপর বললেন, পরিষ্কার মনে পড়ে এখনও। বর্ষাকাল, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেগুন পাতা থেকে, শিয়াড়ী ও গিলিরী লতা থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছিল। ভরা ভাদ্দর। পথের ছুদিকে একেবারে নিচ্ছিদ্র জঙ্গল। হাতীটা বড় বড় গাছপালার ডালের সঙ্গে কাঁধ ছুঁইয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে। হাতীটা যদি পথ ছেড়ে চলে যেতো, অথবা আমাকে চলে যেতে দিতো তাহলে ঐ কাণ্ড হতো না।

সকলকেই ভয় দেখিয়ে, মেরে, জবুথবু করে একেবারে মেগালোমানিয়াক্ হয়ে উঠেছিল। ওর ধারণা হয়েছিল, যে ওকে ভয় না পাবে, ওর বশ্যতা স্বীকার না করবে এমন লোক বুঝি কোথাও নেই। ওর যা খুশী ও তা-ই করবে।

আমি যখন যেমনভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, তেমনই রইলাম, ওকে দেখে নড়লাম না, তখন ও আমার দিকে সোজা তেড়ে এলো—প্যাঁ—এ-এ-এ-এ আওয়াজ করে। বিশ্বাস করুন। জীবনে ঐ প্রথমবার আমিও ভয় পেলাম। অত বড় দাঁতাল হাতীটা, তার শুঁড়—তোলা অবস্থায় সোজা আমাকে পিষ্ট করার জন্যে তেড়ে আসছিল। কালো আকাশ, ওর কালো শরীর, কালচে সবুজ বনের পটভূমিতে ওর সাদা-দাঁতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আমি বললাম, তারপরে কি হলো?

উনি বললেন, সেদিন প্রাণ বাঁচাতে বড় অপমানের সঙ্গে, গ্লানির সঙ্গে এক-বুক ভয় নিয়ে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পথের পাশের ছোট নালায়-নালায় বুকে হেঁটে মাথাটা প্রায় মাটির মধ্যে লুটিয়ে কোনোক্রমে ভীমধারার পাশে ফিরে এলাম। বড় লজ্জায়। সত্যিই বড় লজ্জায়।

চন্দনী আমাকে দেখে দৌড়ে এলো। বলল, কি হয়েছে, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, কিছু না। কিন্তু আমার সমস্ত বুক তখনও ভয়ে ভর্তি ছিল। খেতে বসেও খেতে পারলাম না। সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। এ-পাশ ও-পাশ করলাম বিছানাতে। তারপর শেষরাতে ভেবে ভেবে ঠিক করে ফেললাম যে, হয় আমার ভয় থাকবে না বুকে, নয় আমিই থাকব না। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমি অথবা এই ভয়-দেখানো হাতীটার মধ্যে একজন থাকবে।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে আগেই রাইফেলটা আর কার্তুজগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম টুল্বকা বস্তীর একজন বুড়ো লোককে সঙ্গে নিয়ে।

চন্দ্রকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যেন সব পুরোনো কথা মনে আনছিলেন।

বললেন, প্রথমে আগের দিন বিকেলে যে জায়গায় হাতীটা আমার পথ আটকেছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। বর্ষাকাল, তার উপর সন্ধ্যে থেকে সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। মাটি নরম হয়ে ছিল। হাতীর ভারী পায়ের দাগ মাটিতে বসে গেছিল। তাই তাকে ট্র্যাক করতে অসুবিধে হলো না।

আমাকে তাড়া করে জোরে দৌড়ে গিয়ে হাতীটা পথ ছেড়ে দিয়ে গতকাল গাঁয়ের দিকে গেছিল। সে-রাতেও দুটো ঘর ভেঙেছে দেখলাম, একটা সাদা বাছুর চালার নীচে বাঁধা ছিল। সেই বাছুরটার উপর প্রথমে চালাটাকে ভেঙে ফেলে দিয়ে তারপর চালার উপর পা তুলে দিয়ে, হাতীটা পায়ে চেপে চেপে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার মতো করে বাছুরটাকে মেরেছিল।

হাতে রাইফেল দেখে দুজন লোক দৌড়ে এসে আমার হাতে-পায়ে ধরছিল হাতীটা মেরে দেওয়ার জন্যে। বলছিল, পুরো গ্রামের আমরা না খেয়ে মরে যাব। হয় না খেয়ে, নয়ত হাতীর পায়ে। এর একটা বিহিত করো বাবু। তোমার কাছে আমরা কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

আমি জঙ্গলের পাশে বসে থেকে বুড়োকে পাঠিয়েছিলাম, খোঁজ খবর করতে। ও খোঁজ খবর নিয়ে এলো হাতীটা গ্রাম ছেড়ে পুবে গেছে। আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে গ্রাম এড়িয়ে আবার হাতীর পায়ের চিহ্নে এসে পৌঁছলাম।

রাইফেল হাতে গ্রামের মধ্যে নিজে যেতে চাইনি। কারণ স্বজন ও আত্মীয়র মতো শত্রু আমাদের আর কেউই নেই। যাদের ভালো হবে হাতীটা মারলে, এই অত্যাচারটাকে শেষ করলে, তাদেরই মধ্যে কেউ বন-বিভাগে গিয়ে আমার নামে নালিশ করবে। ফরেস্ট গার্ডের চেয়ে ভালো আর কেউই জানবে না যে, হাতীটা মারা পড়ায় তার নিজের প্রাণও বেঁচেছে। কিন্তু যেই তার প্রাণ বাঁচবে, অমনি সে মানের জন্যে, ডি-এফ-ও সাহেবের পিঠ-চাপড়ানির জন্যে দৌড়ে গিয়ে সদরে আমার নামে লাগিয়ে আসবে। এ-এক আশ্চর্য দেশ! আশ্চর্য মানুষের দেশ! অথচ কী দারুণ দেশ!

আমি বললাম, আপনি যা বলছিলেন, তা থেকে সরে যাচ্ছেন বার বার।

—ওঃ! বলে, চন্দ্রকান্ত একটু থেমে আবার শুরু করলেন।

—ঝক ঝক করছিল রোদ। রাতভর বৃষ্টির পর। গাছে পাতায় পাহাড়ে পাথরে রোদ ঠিক্‌রে যাচ্ছিল। জঙ্গলের গভীর থেকে গ্রামের ফসল লাগানো ক্ষেতগুলো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। ক্ষেতে-ক্ষেতে ধান লাগিয়েছে, ভুট্টা লাগিয়েছে, ছোট ছোট ছেলেরা পাখি তাড়াবার জন্যে ক্ষেতের মধ্যে বানানো মাচায় বসে বাঁশি বাজিয়ে মিষ্টি সুরের গান গাইছে। সেই সকালের শান্ত, সুন্দর উজ্জ্বল আবহাওয়ায় ওদের কচি গলার গান আর বাঁশির সুর বহুদূর থেকে ভেসে আসছে হাওয়ায় হাওয়ায় তির্ তির্ করে।

হঠাৎ সামনে একদল হাতী চোখে পড়ল। হাতীগুলো খুব আস্তে আস্তে পাহাড়ের খোল বেয়ে গভীরতর জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। বোধহয় ধুলোয় কোথাও গড়াগড়ি দিয়েছিল, অথবা কাদায়। গায়ে লাল ধুলো মেখে, লাল মাটির কাদা লেপে ধীর

গতিতে গজেন্দ্রগমনে চলতে-থাকা সারিবদ্ধ হাতীগুলোকে ঘন সবুজ জঙ্গলের আর নীল আকাশের পটভূমিতে পুঞ্জ-পুঞ্জ সিঁদুরে মেঘ বলে মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

বুড়ো বলল, কি দেখছ বাবু?

আমি বললাম, ছাখ বুড়ো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

বুড়ো বলল, সুন্দর না ছাই। ব্যাটাদের সবকটাকে মেরে ফেলতে পারো তো বুঝি। ফসল করার উপায় নেই, ক্ষেত করার উপায় নেই। গুণ্ডামির জ্বালায় প্রাণ বাঁচানো দায়।

আমি হাসলাম। বললাম, তোরা বন কেটে ফসল করবি আর দোষ হবে ওদের। ঠেলতে ঠেলতে তোরা ওদের কতটুকু জায়গাতে কোণঠাসা করেছিস বলত?

বুড়ো বলল, ঠিক আছে। এমনি হাতীদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। যদিও ফসল নষ্ট করে সকলেই। যে গুণ্ডাটার সঙ্গে ঝগড়া তার পায়ে পায়ে চল।

জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর, গভীরতর থেকে গভীরতম হচ্ছে। ভালো করে দেখা যায় না চোখে; দিন-দুপুরেও। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে নালা গেছে অনেক। বর্ষার জল চলেছে কুলকুল করে। হাতীটা পা দিয়ে নরম মাটি চেপে চেপে শক্ত করে নিয়ে তার উপরে পা ফেলে নালা পেরিয়েছে।

আমরা কতদূর চলে এসেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ বুড়ো ফিসফিস করে বলল, বাবু সাবধান। আমরা তেঁতুলিডিহর কাছে এসে গেছি।

আমি বললাম, সেটা কি?

—হাতীর ঘর। এই জঙ্গলের মধ্যে কয়েক শ' বছর আগে একটা গড় ছিল। কোল্‌হো রাজাদের। সেই গড়ের চারপাশে উঁচু জমি। বড় বড় তেঁতুল গাছ। এত বড় বড় তেঁতুল গাছ যে দিনের বেলাও রাতের অন্ধকার। কোনো ফরেস্ট গার্ড কখনও জীবনে এই ডিহর ধারে-কাছে আসে না। আমিও আসি না। এখানে

হাতীদের ঘর। এখানে ওরা ওদের মেয়েদের ভালোবাসে—এখানে বাচ্চা হয় হাতীদের।

একটু থেমে চন্দ্রকান্ত বললেন, একে তো আমার বুকে ভয় সেঁধিয়ে দিয়েছে হাতীটা—তার উপর ঐ জায়গায় পৌঁছে এবং বুড়োর কথা শুনে ভয় আরো বেড়ে গেল। তখন হাঁপানীও তো পুরোমাত্রায় ছিল, ঐ অবধি হেঁটেই দম ফুরিয়ে গেছিল একেবারে।

বললাম, কথা বলিস্ না। গুণ্ডা হাতীটা কাছাকাছিই আছে। দেখ না কিরকম ছমছম্ করছে চারধার?

এখন আর দাঁড়িয়ে চোখ চলে না। এত গাছপালা, লতা-পাতা। সমস্ত জায়গাটায় হাতী ছাড়া আর কোনো জানোয়ারেরই পদচিহ্ন নেই। তেঁতুলিডিহর চারপাশে নানারকম গর্ত হামনদিস্তার মতো। কতগুলো টাটকা, কতগুলো পুরোনো, শুকিয়ে গেছে। যেগুলো খুব পুরোনো সেগুলোর উপর লতিয়ে আছে বুনো লতা। না দেখে পা ফেললে, পা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলাম। আগে পরে নয়। দশ বারো হাত দূরে পাশাপাশি, যাতে অনেকখানি জায়গায় নজর রাখতে পারি।

মনে হলো আবার সামনেই একটা নালা। ঝর্ ঝর্ করে জল বওয়ার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ বুড়ো স্তব্ধ হয়ে গেল দেখলাম। চার হাত-পায়ে মাটির উপর ব্যাঙের মতো বসে ও যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কাদামাখা অবস্থায় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ওকে—ও একবার আমার দিকে তাকাল, তারপরেই ওর চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। সামনের দিকে বিস্ফারিত চোখে ও তাকিয়ে ছিল।

আমি সামান্য এগিয়ে যেতেই দেখলাম, গুণ্ডা হাতীটা নিথর পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে ডিহর পাশে। তার শুঁড়ের ডগা চোখের পাতাটি পর্যন্ত এতটুকু কাঁপছে না। অতবড় জানোয়ার যে কী করে অমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

হাতীটার চোখ দুটো নিষ্পলকে বুড়োটাকে দেখছে। বুড়োকেও দেখে ফেলেছে, তাই বুড়োর দু চোখ ভয়ে বিস্ফারিত।

আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে হাতীর মগজে গুলি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তক্ষুনি গুলি না করলে বুড়োকে বাঁচানো যেতো না। আমাকেও।

আমি হাঁপাচ্ছিলাম, কোনোক্রমে নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাতীটার হৃদয় লক্ষ্য করে আধো শুয়ে আমি গুলি করলাম। হাতীটা আমার কাছ থেকে বড় জোর দশ-পনেরো হাত দূরে ছিল।

গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা শরীরে একটা ঝাকুনি খেলে গেল।

মনে হল ও এক দৌড়ে গিয়ে বুড়োর উপর পড়বে অথবা আমার উপরে। আমি বাঁ দিকের ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে শুয়েই রইলাম। কোনো নড়াচড়া বা শব্দ করছিলাম না যাতে আমাকেও দেখে ফেলতে পারে ও।

পুরো এক মিনিট হয়ে গেল, তখনও হাতীটা যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। তাহলে কি গুলি লাগেনি? দশ হাত দূর থেকে গুলি লাগল না? গুলি লাগলেও হয়তো ওর হৃদয়ে পৌঁছয়নি গুলি। পরমুহূর্তেই আর না-ভেবে ঐ একই জায়গায় আমি তাক করে বাঁ দিকের ব্যারেলও ফায়ার করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো জঙ্গলের নালাটা হাতীর শরীর থেকে ঝর্ণা হয়ে পড়ছে। হাতীটার বুক থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোতে লাগল মোটা ধারে। ছড়্ ছড়্ শব্দ করে সে রক্ত পড়তে লাগল। সেই গরম দুর্গন্ধ রক্ত ছিটকে আসতে লাগল আমাদের মুখে, চোখে, গায়ে।

হাতীটা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না একটুও।

আমি এবার আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে পেছোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাইফেল খুলে গুলিরি-লোড করলেই শব্দ হবে। বুড়ো

কি করছে তখন দেখার সময় ছিল না। পেছোতে পেছোতেই দেখলাম যে, হাতীটার গা থর্থর্ করে কাঁপছে। হঠাৎ হাতীটা সামনের একটা গাছের ডালকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে জোর পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গাছের পাতাগুলো ডাল-গুলো প্রচণ্ড জোরে ঝেঁকে উঠল, তারপর মড়াৎ করে ভেঙে গেল ডালটা। ডালটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে হাতীটা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

আমরা যখন তেঁতুলিডিহির ঘন অন্ধকার গা-ছম্ছম্ এলাকা পেরিয়ে আলোতে এলাম, তখন আমার বুকটা হাল্‌কা লাগতে লাগল। আমার বুকের ভয়, হাতীটার বুকে, তার রক্তের ফোয়ারার মধ্যে সেঁধিয়ে দিতে পেরেছি জেনে ভালো লাগল। হাতীটা বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আমায়।

যখন ফিরে আসছিলাম, আবার ধান-ভুট্টার ক্ষেতের পাশ দিয়ে বিকেলের রোদের মধ্যে ফসল পাহারা দেওয়া ছেলেদের গানের মধ্যে তখন ভালো যেমন লাগছিল, হঠাৎ হঠাৎ বড় খারাপও লাগছিল। নিজেকে একবার ভীষণ গর্বিত, বড় শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছিল আবার পরক্ষণেই বড় হীন, দুর্বল, বড়ই তুচ্ছ বলে। অন্যজনের বুকের রক্তে ফোয়ারা ফুটিয়ে নিজের বুকের ভয়কে উড়িয়ে দিলাম; তবুও।

অনেকক্ষণ তারপর চুপ করে থাকলেন চন্দ্রকান্ত।

হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, কেন এমন হয় বলুন তো? আমরা সম্পূর্ণ ভাবে জানি না নিজেদের। নিজেদের বুঝতে পারি না কেন?

আমি হাসলাম একটু। হেঁয়ালীর মতো দেখালো বোধহয় আমার হাসিটা।

বললাম, কি জানি? বোধহয় আমরা মানুষ বলে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, হয়ত। হয়ত তাই।

চন্দ্রকান্তর গল্প শুনতে শুনতে কখন যে আকাশে মেঘ জমেছে লক্ষ্য করিনি। ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে আকাশময় ওড়াউড়ি করছে। ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আবহাওয়া সত্যিই দেখতে দেখতে বৃষ্টির মতোই হয়ে উঠল।

আমি নিজের মনেই হেসে উঠলাম।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কি হলো?

বললাম, ব্যাঙ ডাকছিল, চন্দনী কিন্তু তখনই বলেছিল যে, বৃষ্টি হবে। আমি বলেছিলাম, হতেই পারে না—দোল পূর্ণিমার দুদিন আগে বৃষ্টি হয়? আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। ও বলেছিল, হবেই। বাজী হারলাম দেখছি।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন।

বললেন, সত্যিই তো। হবে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, আমি চলি এবারে। বৃষ্টি সত্যিই এলে মুশকিল হবে। সব ভিজে যাবে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, চলুন, আপনাকে নালাটা অবধি এগিয়ে দিই।

নালার দিকে চলতে চলতে চন্দ্রকান্ত হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন: শহরে আপনাকে ফিরতেই হবে, না? থেকে গেলে হতো না? চন্দনী মেয়েটা কিন্তু বড় ভালো। মেয়ে হিসেবে। আসলে আমিই কোনো মেয়ের যোগ্য নই। মেয়েরা যা চায় আমার মধ্যে সেই বশংবদ মনোবৃত্তি নেই। আমার জীবনে ঘর-সংসার মানায় না।

তারপর থেমে বললেন, থেকেই যান না। আমাদের বন-পাহাড়ের একজন হয়ে, চন্দনীর চিরদিনের মালিক হয়ে? আপনাকে পেলে ও বড় সুখী হবে। আপনিও। দেখবেন।

বললাম, দেখি। ভেবে দেখব।

—দেখুন ভেবে। চন্দ্রকান্ত বললেন।

মাঠিয়াকুতু নালার পাশে পৌঁছতে না পৌঁছতেই টুপ্‌টাপ্‌ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। চাঁদনী রাত বলে টর্চ নিয়ে যাইনি সঙ্গে। সত্যিই যে বৃষ্টি নামবে, আকাশ অন্ধকার হবে ভাবিনি। এটুকু পথ অন্ধকারে হেঁটে আসতে বেশ অসুবিধা ও অস্বস্তি হচ্ছিল। গরম যদিও তেমন পড়েনি, তবুতো শীতও নেই। এই প্রথম বৃষ্টিতে সাপ ও বিছেরা বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার পথে এ সময়ে চলা উচিত নয়।

এখনও বোধহয় কারো ঘুম ভাঙেনি। জল গায়ে পড়লেই ঘুম ভাঙবে। ক্যাম্পের আশে-পাশের গাছ-গাছালির পাতা যতক্ষণ না ভিজে যাচ্ছে ততক্ষণই নীচে জল পড়বে না।

আমি গিয়ে ঝুপড়ির সামনে দাঁড়ালাম।

ডাকলাম, চন্দনী।

—কে? কে? বলে, চন্দনী ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর দৌড়ে এলো আমার কাছে।

আমি ওকে দু হাতে ধরে থাকলাম।

ও আমার বুকে মুখ রেখে বলল, বড় ভয় পেয়েছিলাম। অন্ধকারে তোমায় প্রথমে চিনতে পারিনি। ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিলাম।

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে।

ও অনেকক্ষণ অমনিভাবে রইল। তারপর বলল, জীপের পিছনে যে ত্রিপলটা আছে, এসো, দুজনে মিলে ধরাধরি করে ঝুপড়ির মাথায় দিয়ে দিই।

তাই-ই করলাম। ত্রিপল বিছোনো হলে, ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখি, পৌনে চারটে বাজে। একটু পর বনমোরগ, ময়ূর, অন্যসব পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করবে। কিংবা কি জানি আজ জলজ অন্ধকারে ওদেরও বোধহয় ভোর হলো কি না হলো বুঝতে ভুল হয়ে যাবে।

ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় শীত করছে। চন্দনীকে বললাম, এসো, আমার কাছে এসো, আমাকে গরম করে দাও।

চন্দনী আমার বুকের কাছে সরে এলো। আমি বাঁহাত দিয়ে ওর লতানো হাত দুটি, ওর সরু কোমর জড়িয়ে রইলাম।

ও ফিসফিস করে বলল, আমি কি তোমার লেপ না কম্বল?

আমি বললাম, দুই-ই।

তারপর বললাম, এখন ঘুমোও।

অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি চন্দনী নেই। মেঘ সরে গেছে। বৃষ্টি-ধোওয়া গাছ-পালায় সকালের রোদ ঝক্‌মক্ করছে। বাইরে নানা লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। ক্যুপ্-কাটার কুলীদের আজ হাজ্‌রীর দিন। রত্নাকর কখন এসেছে জানি না। এখন একটা পাথরে বসে টিপ সই নিয়ে সকলকে হপ্তা দিচ্ছে। আজ হাট আছে তিন ক্রোশ দূরে। রোজ পেয়ে সকলে হাটে যাবে। নুন কিনবে। তেল কিনবে, সামান্য কেরোসিন এবং সর্ষের। আফিং-এর গুঁড়ো, একটু শাকসবজি। মেয়েরা নিম করৌঞ্জের তেল, লাল-নীল ফিতে। শাড়ি ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে শাড়ি। ছেলেরা গামছা। শাড়ি গামছা বছরে একবারের বেশী কিনতে পারে না ওরা।

দেখি, চন্দনী কাঁচের গ্লাসে করে চা এনে দাঁড়িয়েছে। চন্দনীকে সবসময়ই সুন্দর দেখায়। ঘুম ভেঙে, ঘুমন্ত অবস্থায়, দুপুর, সন্ধ্যে সবসময়।

বলল, কাল রাতে আসতে ভিজেছো বৃষ্টিতে, আদা দিয়ে চা বানিয়েছি। ওঠো, চা খাও।

চা নিয়ে, গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে এলাম।

বললাম, চল, আমিও আজ হাটে যাব। হাট পর্যন্ত জীপ যাবে?

ওরা সকলে খুব খুশী হলো। বলল, জীপ রেখে হাঁটতে হবে কিছুটা।

বললাম, ঠিক আছে।

রত্নাকর তাচ্ছিল্যর গলায় বলল, আপনি আবার এ-হাটে কি কিনতে যাবেন? এ হাটে ভদ্রলোকরা যায় না।

ও যে ভদ্রলোক, তা একাদশ-ফেল রত্নাকর বিশেষভাবে জানে।

আমি বললাম, আমি যে ভদ্রলোক তা জানলি কি করে তুই?

রত্নাকর বলল, কি যে বলেন, তার ঠিক নেই।

রত্নাকর এসব হাটে যায় না। ওখানে বন-জঙ্গলের ঠিকাদারদের ক্যুপ্-কাটা কুলীদের ভিড়। ওখানে শ্রেণী-সচেতন মুহুরীরা যায় না। নারাণ কালিন্দীদের মতো কাউকে পাঠায়।

চন্দনী বলল, নারাণদা তাড়াতাড়ি ভাত চাপাও। খেয়ে-দেয়ে যাবে তো?

—হ্যাঁ? হ্যাঁ। নারাণ বলল। তাড়া কিসের? নারাণ যতক্ষণ না যাবে, হাট উঠবে না ততক্ষণ। বসবেও না।

বেলা দশটা বাজে। এবার নালার উপরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও চান-টান সারতে হয়। এমন সময় হঠাৎ একটা জীপ আসতে দেখা গেল। এত লোকের গণ্ডগোলে এতক্ষণ শব্দটা কানে আসেনি কারো।

জীপ থেকে একজন দারোগা ও ফরেস্টার নামলেন। দারোগার চোহারাটা কচ্ছপের মতো। খাদ্য-পানীয় ও বিনা আয়াসের রোজগারে লোকটা তামসিকতার এক স্থূল দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে। ফরেস্টারের চেহারা সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিক ; ফর্সা, রোগা, ছিপছিপে ভালোমানুষ মুখ।

ফরেস্টার বললেন, এখানে কাল শম্বর মারা হয়েছে?

রত্নাকর অবাক হওয়ার স্বরে বলল, তাই নাকি? আমি জানি না তো? কাল আমি ছিলাম না সারাদিন।

কম্ফু মাটিতে বসে ওর সাপমুখো লাঠিটাতে কি যেন মালিশ করছিল।

হঠাৎ দারোগা ওকে ডেকে বললেন, তোর নাম কি? কি করিস তুই?

কম্ফু ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার নাম কম্ফু। জড়ি-বুটির বদ্যি আমি। বলদের চিকিৎসা করছি।

দারোগা বললেন, তুই কিছু জানিস?

—কি জানি? বলে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল কম্ফু।

—শম্বর মারা হয়েছে কিনা?

—তা কে না জানে? সকলেই তো জানে। সকলেই মাংস খেয়েছে। আমরা সকলে মিলেই মাংস ভাগ করে খেয়েছি।

—সে কথা বলছি না। কে মারল শম্বরটাকে? সেই কথা জানতে চাইছি। দারোগা বললেন।

কম্ফু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বোকার মতো মুখ করে বলল, ভগবানে মেরেছে বোধহয় আমাদের খাওয়ার জন্যে। কতদিন আমরা মাংসের মুখ দেখিনি। দেড়-দু'বছর।

—ভগবানে মেরেছে মানে? দারোগা চটে উঠে বললেন।

কম্ফু আবারও বোকা বোকা মুখ করে বলল, বাজ পড়ার আওয়াজ হলো পাহাড়ের উপর। দৌড়ে গিয়ে দেখি শম্বরটা মরে পড়ে আছে।

—ইয়ার্কি পেয়েছিস? দারোগা বললেন। গুলির শব্দ পাওয়া গেছে ছবিবাবুর ক্যাম্পেও। তুই বলছিস ভগবানে মেরেছে?

কম্ফু আবারও বলল, গুলি কি বাবু? আফিং-এর গুলি? সে তো নারাণ সকাল-সন্ধ্যা খায়। শব্দ তো শুনিনি কখনও।

দারোগা বললেন, চল্, তোকে এক্ষুনি বেঁধে নিয়ে যাব। দারোগার সঙ্গে ফাজলামি! কার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় জানিস না?

কম্ফু বলল, তা যা বলেছেন। ঐ জন্যেই সকলের সঙ্গে ঝগড়া হয় আমার সবসময়। সবসময়। আমার বউকে জিজ্ঞেস করুন। বলেই, হেই সীতা, বলে বউকে ডাক দিলো।

নারাণ বলল, তোর বউ কি ঘরে আছে? জঙ্গলে গেছে।

—ওঃ। বলল কম্ফু। যেন নিরাশ হলো সাক্ষীর অভাবে।

দারোগা বলল, কে মেরেছে না বললে এখানে যত লোক আছে সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাব।

কম্ফু বলল, এক জীপে কি অত জায়গা হবে? তারপরই আমার দিকে ফিরে বলল, বাবুর জীপ নিলেও হবে না। দু' জীপেও না।

একটু থেমে বলল, বাবুকেও বেঁধে নিয়ে যাবেন না কি?

দারোগা বলল, বাবু-টাবু বুঝি না, সকলকেই বেঁধে নিয়ে যাব।

এতগুলো লোকের সামনে আমাকেও বিনা কারণে বেঁধে নিয়ে

যাওয়ার কথায় আমার একটু অবাক লাগল। রাগও হলো। গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা এইরকম দারোগাকেই সরকার বা সরকারের প্রতিভূ বলে জানে। এই বাঁশবনে শেয়াল রাজা দারোগার এত আস্ফালন সহ্য হলো না আমার।

আমি বললাম, আপনি অবান্তর কথা বলছেন।

দারোগা তখন আমাকেও চোখ রাঙিয়ে বলল, পুলিশের লোকে এমনি করেই কথা কয়, আমাকে সহবৎ শেখাবেন না, ধরে তাহলে সত্যিই নিয়ে যাব থানায় আপনাকে সহবৎ শেখাবার জন্যে।

আমি বললাম, তাহলে যদি বলি আমিই মেরেছি। আপনি কি আমাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন?

চোখের কোণে দেখলাম, কস্ফু নারদের মতো নড়ে-চড়ে বসল।

দারোগা এক হাঁক ছাড়লেন। দুজন হাফ-প্যান্ট পরা লাঠি হাতে পুলিশ এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

দারোগা বললেন, অবশ্যই রাখি।

চন্দনী খুব ভয় পেয়ে গেল। ও দৌড়ে কস্ফুর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল জড়সড় হয়ে।

দারোগা চন্দনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

আমি বললাম, এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আপনার লোকদের এখানে থেকে এক্ষুণি সরে যেতে বলুন। আপনি ভেবেছেন কি? কি ঠাউরেছেন নিজেকে।

আমার কথাতে পুলিশগুলো সরে গেল বটে কিন্তু দারোগা কোমরে হাত দিয়ে রিভলবার বের করতে গেলেন।

আমি মুখে আর কিছু না বলে কোমর থেকে পিস্তল খুললাম।

দারোগা হাত নামিয়ে নিলেন।

ফরেস্টার দারোগাকে কানে কানে কিসব বললেন।

আমি বললাম, ফের রিভলবারের ভয় দেখিয়েছেন তো খারাপ হবে।

দারোগা বললেন, আপনি দারোগাকে ধমকান্। সাহস তো কম নয় আপনার।

আমি বললাম, দারোগা নিজে যদি আসামীর মতো ব্যবহার করে তাহলে আর কি করা যায়?

এমন সময় পথের উপর থেকে কে যেন বলে উঠল, ঝগড়াটা কিসের? কার সঙ্গে কার ঝগড়া?

চোখ তুলেই দেখলাম, চন্দ্রকান্ত। একটা পাথরের উপর বসে আছেন। তুটো গাছের ফাঁকে।

দারোগা বললেন কনস্টেবলদের, এই ধর, ধর, পালিয়ে না যায়; ঐ সেই হাতী-মারা ফেরারী।

কনস্টেবলদের খুব একটা উৎসাহ দেখা গেল না চন্দ্রকান্তকে ধরতে যাওয়ার।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আমিই আসছি দারোগাবাবু। অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে এতখানি চড়াই উঠতে আপনার কষ্ট হবে। আপনার কনস্টেবলদেরও।

বলেই, তর তর করে চন্দ্রকান্ত নেমে এলেন। পাথরে পাথরে পা রেখে পাকদণ্ডী দিয়ে। যে পাকদণ্ডী দিয়ে প্রথম দিন আমি কম্ফুকে নামতে দেখেছিলাম।

দারোগা কোমরের কাছে একবার হাত এনে, আমার দিকে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ছবি নায়েক কি বলেনি যে, কে মেরেছে শম্বরটা? আপনারা জানেন না? কি ফরেস্টারবাবু?

ফরেস্টারবাবু বললেন, জানি।

—দারোগাবাবু কি জানেন? চন্দ্রকান্ত বললেন।

—জানি, দারোগাবাবু বললেন।

—তবে? আপনারা আমার কাছে না এসে এদের উত্ত্যক্ত করছেন কেন?

দারোগাবাবু রেগে বললেন, আপনার ঠিকানা কি আপনি থানায় দিয়ে এসেছিলেন?

—না। তা দিইনি। তবে আপনার বন্ধু ছবি নায়েকের কাছে

ছিল। ইচ্ছে করলেই আসতে পারতেন।

তারপরই চন্দ্রকান্ত ফরেস্টারকে বললেন, নমস্কার ফরেস্টারবাবু, আপনার মেয়ের অসুখ করেছিল, কেমন আছে এখন?

ফরেস্টারবাবু এই অভাবনীয় ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন, আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যাঁ! ভাল আছে।

—ভালো লোকদের সব খবর রাখতে হয় আমার। খারাপ লোকেরও।

বলেই, দারোগাবাবুকে বললেন, সদরের সেই আফিং-এর চোরাকারবারীর সঙ্গে দোস্তী চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও? কামাই জোর হচ্ছে বলুন!

দারোগাবাবুর মুখ বেগ্‌নে হয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত আমার দিকে ফিরে বললেন, আমি নাম-ঠিকানা সব দেবো, একটা ভালো করে লিখে দেবেন তো আই-জিকে। আমি একটা শম্বর মেরে যারা দেড় বছর মাংস খায় না তাদের খাইয়ে মহাপাতকের কাজ করেছি। আমাকে ধরতে এসেছেন ইনি!

দারোগাবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখে নেবো।

—দেখে নেবো কেন? এখুনি দেখুন। আসুন আমাকে বেঁধে নিয়ে যান পারেন তো? এমন দিন-দুপুরে না পারলে পরে কি আর পারবেন? চন্দ্রকান্ত বললেন।

তারপর বললেন, আমার অপরাধটা কি? একটা শিঙাল শম্বর মেরেছি এই-ই তো। আপনি আপনার শালাকে নিয়ে গত মাসে রাতের বেলা তিনটে মাদী শম্বর মেরে নিয়ে যাননি? এই জঙ্গল থেকে? বলুন আপনি? তারিখ বলব, কবে? জীপের নাম্বার বলব?

দারোগাবাবু আঁৎকে উঠলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আইন যাঁরা খাটান, দয়া করে তাঁরাও আইনটা মানবেন। যান। এবার বাড়ি যান। ওঃ হোঃ ভুলেই গেছিলাম। এখন তো ছবি নায়েকের কাছে যাবেন। আজ রাতটা নিশ্চয়ই কাটাবেন ওখানে। ফুর্তি-টুর্তি হবে। তাই-ই না?

দারোগাবাবু ফরেস্টারবাবুকে প্রায় টেনে নিয়ে জীপে উঠলেন।

জীপটা স্টার্ট করতেই চন্দ্রকান্ত একেবারে দারোগার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আবারও হয়ত এখানে আপনাকে আসতে হবে। তখন এদের কাছে না এসে সোজা আমার কাছেই আসবেন। নইলে, অন্য কাউকে পাঠাবেন—যে পরিষ্কার, যার নিজের লুকোনোর মতো কিছু নেই, যার সাহস আছে, যার সঙ্গে লড়ে মজা, এমন লোককে। আপনি মশাই একটা ছুঁচো। আপনার গাল-পোড়া বেঁটে বন্ধুর মতো।

দারোগাবাবু কনস্টেবলগুলোর সামনে চুপ করে বসে রইলেন।

জীপটা চলে গেল ধুলো উড়িয়ে।

নারাণ বলল, বাবু চা খাবেন?

—চা? খাওয়া। বহুদিন খাইনি।

তারপরই চন্দনীকে দেখতে পেয়ে বললেন, কি রে? কেমন আছিস? সুখেই তো আছিস মনে হচ্ছে।

চন্দনীও ঠেস্ দিয়ে বলল, তা আছি! তোমার সঙ্গে থাকতে সুখ কাকে বলে জানতে পারলাম কই?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, তোর সুখ আর আমার সুখ আলাদা রে চন্দনী। রাগ করিস্ কেন? সবাই কি সবাইকে সুখী করতে পারে?

রত্নাকর এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়েছিল।

চন্দ্রকান্ত বললেন, রত্নাকর কাছে আয়।

রত্নাকর কাছে আসতেই হঠাৎ এক প্রচণ্ড চড় লাগালেন চন্দ্রকান্ত রত্নাকরকে।

চড় খেয়ে রত্নাকর ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। ওর কর্তৃত্ব, ওর হাতঘড়িশুদ্ধু হাত, ওর অথরিটি সব ধুলোয় ধুলো হলো।

সকলে এ ব্যাপারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমিও।

রত্নাকর উঠে বসল মাটিতে, গালে হাত দিয়ে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, কাল দারোগাকে খবর দিয়েছিলি তুই? তুই নিজে কুটরা মেরে খাস্ না? শম্বর তো মেরেছি আমি, কিন্তু

আমি কি খেয়েছি ? তোদের জন্যেই মেরেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শোন রত্নাকর। আর কখনও যদি জানতে পাই যে, তুই গোয়েন্দাগিরি করেছিস, তোকে গুলি করে মেরে ঝুলিয়ে রাখব এই গাছটায়।

আবার বললেন, দেখে নে ভালো করে ; এই গাছটায়।

রত্নাকর মুখ নীচু করে, অত লোকের সামনে, ওর সমস্ত মাতব্বরী ধূলোর সঙ্গে লুটিয়ে ক্যাপ্-কাটা কুলিদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঢুকে গেল ঝুপড়ির মধ্যে।

চা খেতে খেতে চন্দ্রকান্ত বললেন, সৌমেনবাবু কবে আসবে রে ?

নারাণের মালিক চন্দ্রকান্তর হাতে মার খাওয়াতে নারাণ চন্দ্রকান্তর সঙ্গে ঠিক কি রকম ব্যবহার করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। চাকরী গেলে সর্বনাশ। আফিং-এর গুলি না হলে ও মরে যাবে। একদিনও বাঁচবে না। এ ভব সংসারে "আফিং আর দীনবন্ধু ছাড়া ওর আর কেউই নেই।"

নারাণ ঝুঁকি না নিয়ে বলল, আমি জানি না।

চন্দ্রকান্ত আর কোনো কথা না বলে চায়ের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে পাকদণ্ডী দিয়ে উঠে জঙ্গলে মিলিয়ে গেলেন।

অপস্রিয়মান চন্দ্রকান্তর দিকে চেয়ে দেখলাম, ওঁর হাত খালি। বন্দুক রাইফেল কিছুই নেই সঙ্গে। ভাবলাম, দারোগা তবুও ছেড়ে দিয়ে গেল কেন ওঁকে ?

তারপরই মনে হলো, ভয়ের জন্যে। দারোগার বুকে ভয় আছে। অনেক কিছুর ভয়। অনেক অন্যায়ের ভয়ের পোকা দারোগার বুকে থিক থিক করছে। অন্য দিকে চন্দ্রকান্তর বুক ভয় শূন্য। চন্দ্রকান্তর পায়ের শব্দ জঙ্গলের শুকনো পাতার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমার বয়স হলো অনেক কিন্তু জীবনে যেন এই প্রথমবার উপলব্ধি করলাম যে, কার হাতে কোন হাতিয়ার থাকে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কার বুকে কি থাকে সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। হাতে হাতিয়ার না থাকলেও যায় আসে না, হাতটা পরিষ্কার থাকা

চাই। এমন ক'টা লোক সংসারে আছে যে, দু'হাত উপরে তুলে বলতে পারে যে, 'ছাখো! আমার হাতে ময়লা নেই কোনো, লুকোবার নেই কিছুমাত্র। আমি পরিষ্কার।'

কস্ফু বলল, আমি যাই একটু ঘুরে আসি।

বললাম, কোথায় যাবে?

চন্দনী, চন্দ্রকান্ত চলে যাওয়া অবধি চুপ করেই ছিল। ও হঠাৎ বলল, আমিও যাব।

—কোথায়? আমি শুধোলাম।

—তোমার সঙ্গে। আমারও বেড়ানো হবে।

বুঝলাম, যদিও চন্দ্রকান্তকে ও আর স্বীকার করে না, চন্দ্রকান্তও স্বীকার করে না ওকে। কিন্তু যেখানে চন্দনী আছে, যাদের আশ্রয়ে, সেই তাদেরই মাতব্বর রত্নাকরকে চড় মেরে গেলেন চন্দ্রকান্ত। এইটা বড় অস্বস্তির কারণ হয়েছিল ওর কাছে।

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে সেকথা বুঝলাম।

বললাম, এসো। চলো আমাদের সঙ্গে।

বসন্তবনের দুপুরে পাহাড়-জঙ্গলে হেঁটে বেড়ালে নেশা ধরে। এ নেশা আফিং-এর নেশার চেয়েও অনেক গাঢ়। ঝুরু ঝুরু করে হাওয়া বইছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আমের বোলের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে প্রথম মহুয়ার গন্ধ। এখন প্রজাপতির দিন। রঙ-বেরঙের প্রজাপতির সুতো দিয়ে সবুজ বনের জমিতে কোন অদৃশ্য নিপুণ রসিক তাঁতী যেন তাঁত বুনে চলেছেন। রঙে-রঙে কাটাকুটি, মেশামেশি হয়ে রঙ-বেরঙে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কাঁচপোকা উড়ছে। তার ডানায় চেক্নাই উড়ছে। নেপালী ইঁদুর তাদের গাঢ় বাদামী শরীরে শরীরে রোদ প্রতিফলিত করে বড় বড় গাছের ডাল-পালা পাতা ঝাঁকাঝাঁকি করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ধূসর-কালো কাঠবিড়ালী তার ছোট ছোট দুই হাতের মধ্যে জংলী ফল ধরে গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে লাজুক চোখে উঁকি মারছে। পাখি-গুলোর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই মাটিতে কে হেঁটে গেল না গেল।

রোদভরা বাসন্তী আকাশ ওদের ডাক দিয়েছে। নীচের পত্র-পুষ্পশোভিত বিচিত্রবর্ণের বসন্তবন আর উপরের অশেষ আকাশ এই নিয়েই ওরা খুশী আছে। মাঝে মাঝে কোনো বোকা পাখি, বাজের মতো, চিলের মতো, পাহাড়ী ময়নার মতো, আকাশের ওপারে কিছু আছে কি না দেখার জন্যে উড়ে উড়ে সোজা উপরে উঠে রোদ-চকচক ছোট্ট বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তারপর আকাশের বুকে আরও আকাশ, তার পরেও আরও আকাশের খোঁজ নিয়ে ফিরে আবার তাদের ভালোবাসার, গন্ধের, শব্দের, ফুলফলের পৃথিবীতে নেমে আসছে। গলা তুলে এ ওকে ডাকছে, গদগদ হয়ে কত কথা বলছে।

একটা অর্জুনের ডালে রোদ এসে পড়েছে। তার পাতায় একটি ছোট্ট মৌসুমী পাখি বসে শীষ দিচ্ছে। আমার পা থমকে গেল। চন্দনীর হাত ধরে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে। কতটুকু পাখি! কিন্তু ঐটুকু পাখিকে ভগবান কী দেননি! চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, মুখ। শুধু ঠোঁটই যে দিয়েছেন, তাই-ই নয়, সেই ঠোঁটে কী সুর দিয়েছেন, কী গায়কী! ওকেও খেতে শিখিয়েছেন, ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। যা দেননি তা আমাদের মতো সর্বগ্রাসী ক্ষিদে, লোভ, ঈর্ষা, ক্ষমতার কামনা, পরশ্রীকাতরতা। ঐ সামান্যতার মধ্যেও ওকে আমার মতো দম্ভভরা মরণশীল মানুষের চেয়ে কত বড় করে দিয়েছেন। ভাবলে অবাক লাগে।

একটা পাখি যখন ডানা মেলে উড়ে যায়, একটা পাতা যখন হাওয়ায় বৃন্তচ্যুত হয়ে ঘুরে ঘুরে আরতি করে ধরিত্রীর পায়ে পড়ে, এক গুচ্ছ ফুল থেকে, আমের বোল থেকে যখন গন্ধ ওড়ে, যখন হরিণী তার কাজলকালো চোখে চকিতে চেয়ে বনের গভীরে শুকনো পাতায় মচ্‌মচানি তুলে দৌড়ে যায়, চিতাবাঘ যখন তার চিত্র-বিচিত্র শরীরে জঙ্গলের কিনারায় চিত্রার্পিতের মতো নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়, তখন বারবারই আমার মনে হয় মিছিমিছি মানুষ হয়ে জন্মালাম। শুধু দম্ভ নিয়ে, গর্ব নিয়ে, সংস্কার নিয়ে নীচ ঘৃণিত এক সম্মানের ও ক্ষমতার লোভ নিয়ে মিছিমিছিই এই জীবনটাকে নষ্ট করে গেলাম।

ওদের মতো হলে কত সহজে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারতাম। না জেনেই তাঁকে ভালোবাসতে পারতাম! নিজের অজ্ঞাতসারে, আত্মশ্লাঘা আর উচ্চমন্যতায় কুব্জদেহ আঁতেলসভার সমর্থন ও শিরোপা ছাড়াই সর্বোত্তম উত্তরণের শরিক হতে পারতাম। কিছুই হলো না। বনের জন্তু না হয়ে শহরের জন্তু হয়ে সমস্ত জীবনটাই বরবাদ্ হয়ে গেল।

চন্দনী আমার হাতে টান দিলো। চমক ভঙল আমার। দেখি, কম্ফু অনেক দূরে চলে গেছে।

একটা মৌটুসী পাখি উড়ল। আর্জুনের ডালটা কাঁপতে লাগল। কাঁপতে লাগল পাতাগুলো। কম্পমান সবুজ পাতাগুলো হলুদ রোদটাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, একটা আমলকী গাছের নীচে একজোড়া রাজ ঘুঘু, ফল্‌সা রঙা। সুডৌল পুরুষ ঘুঘুটা বড় আদরে, বড় সোহাগে, বড় সযত্নে স্ত্রী ঘুঘুটাকে আদর করছে।

আমার কী হলো জানি না আমি। চন্দনীকে আমি দু'হাত দিয়ে কাছে টানলাম। আমার ঠোঁট ওর ঠোঁটে আমার বুক ওর বুকে! তারপর বড় আদরে, বড় সোহাগে, বড় যতনে, ঘুঘুটার কাছ থেকে শিখে চন্দনীর ভিজে নরম কমলা-কোয়া ঠোঁট, নিঃশেষে আমার ঠোঁট দিয়ে চুষে নিলাম। শুধুমাত্র চন্দনীর ঠোঁটই নয়, তার সঙ্গে এই বসন্তবনের মধ্য দিনে যত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ছিল তার সবটুকু আর্দ্রতা এবং জ্বালাও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি নিংড়ে শুষে নিলাম, নিতে থাকলাম; চন্দনীর ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে।

আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো ভালোবাসায়, ভালোলাগায়। শরীর, এই ডিজেলের ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া, এই কয়লার ধোঁয়ায় কালো শরীরে যে এত কোষ আছে, তা আমি এর আগের মুহূর্তেও জানি নি। বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে সে কথা এই প্রথম আমায় জানান্ দিলো।

বয়সের হিসাবে যুবক হয়েছিলাম আগে, আজ আমি এই দুপুরে

এই বনের আলোছায়ায়, এই পাখির ডাকে ফুলের গন্ধে, চন্দনীকে বুকে করে প্রথম জানলাম যে, যৌবনের মানে কি। যৌবনের পরিপূর্ণতা, পরিপ্লুতী কোথায় ?

মনে মনে বললাম, চন্দনী, আমার চন্দনীরে! ভাগ্যিস তুই ডাক পাঠিয়েছিলি আমার। নহলে বালকত্ব আমার কখনও ঘুচতো না। একদিন যৌবনকে টপকে গিয়ে বার্দ্ধক্যের দরজায় কড়া নাড়তাম। এই যৌবন, এই বন, এই চন্দনী ; আমি কি করব। কি করব আমি এত আনন্দ নিয়ে ? আমি আজ রাজাধিরাজ। এইই প্রথম, আমার প্রথম কৈশোরের প্রেমিকা এই প্রকৃতিরই বুকে দাঁড়িয়ে, তারই এক স্নেহধন্যা বন্যা মেয়েকে মিয়ে আমি আমার যৌবনের পুরুষসত্তাকে নিবেদিত করলাম অনাদিকালের স্নিগ্ধ অথচ ঝাঁঝালো প্রকৃতিসত্তার কাছে।

চন্দ্রকান্ত! তুমি অনেক বড়। তুমি সাধারণ নও। আমাদের আশীর্বাদ করো যেন আমরা সাধারণ মানুষ ও মানুষী হিসেবে এই বনভূমিতে বাকী জীবন বড় সুখে, বড় ভালোবাসায় কাটাতে পারি। বেশী লোভ নেই আমার। সামর্থ্যও নেই। তুমি আগে যেও, আমরা পেছনে থাকব। তোমার মতো ত্যাগ আমার জন্যে নয়। আমি আমাকে ভালোবাসি, এই পৃথিবীকে ভালোবাসি, এই নরম লতানো শরীরের পাখির মতো ওম-ধরা মসৃণ বুকের চন্দনীকে ভালোবাসি। আমাকে এই ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে দাও। চন্দনীকে আমার মতো করে পুজো করতে দাও আমায়।

হঠাৎ উপর থেকে কম্ফু হাঁক দিলো।

বলল, কি হলো ? কাঠের মতো দাঁড়িয়ে কেন ? সাপ ?

চন্দনী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। বলল, কম্ফু ভাইরে। পঙ্খচূড়। পায়ে দাঁড়িয়ে মুখে ছোবল মারে।

কম্ফু প্রথমে বুঝল না। না বুঝেই, তর্‌তর্ করে কিছুটা নেমে এলো উৎরাই বেয়ে। তারপরই বুঝতে পেরে, হেসে ফেলল।

বলল, দারোগা ব্যাটা যাওয়ার পর তবু একটু হাসা গেল।

আমি বললাম, কম্ফু, কাম-জ্বরের কোনো ওষুধ আছে ?

কম্ফু হাসল। বলল, আছে আছে। সব ব্যারামেরই ওষুধ আছে। ওষুধ তো সামনেই আছে। কিন্তু অনুপান নেই। অনুপান তৈরি করে দেবো যদি চাও।

আমার বড় খুশী খুশী লাগছিল নিজেকে। অর্গলমুক্ত।

বললাম, দিও দিও ; শিখিয়ে পড়িয়ে দিও। আমি বড় আনাড়ী।

কম্ফু হেসে উঠল। চন্দনী লজ্জা পেল।

তারপর আমরা তিনজনেই আবার উঠতে লাগলাম উপরে।

উপরে যখন উঠে এলাম, তখন চোখ জুড়িয়ে গেল। আধ স্কোয়ার কিলোমিটার মতো একটা মালভূমি—চতুর্দিকে ঘন সেগুনের বন। পাতাগুলো হাতীর কানের মতো বড় বড়। তারপর একটু ঝোপ-ঝাপ অর্জুন শিয়ারি, গিলিরি, কিছু কিছু বাইগবা, তারপরই ফাঁকা মালভূমি। নীচে ঝোপ-ঝাড় লতাপাতা কিছু নেই। সমস্ত জায়গা-টায় কয়েকশ আমলকী গাছ। শুধু ফলে ভরা। সব পাতা ঝরে গেছে, শুকনো ডালে ডালে লক্ষ লক্ষ আমলকী। গাছতলায় কত যে আমলকী পড়ে আছে, তা কি বলব। আমলকী আরও দেরীতে ফলে অন্যান্য জঙ্গলে, এখানে কিসের তাড়া বুঝলাম না।

কয়েকশ পাখি এসে জমেছে জায়গাটায়। ময়না, টিয়া, বুলবুলি বসন্তবৌরি, পাহাড়ী ময়না, কুম্ভাটুয়া, দোয়েল, কোকিল আরো কত শত নাম না-জানা পাখি।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়েছিলাম।

কম্ফু বলল, এটা বারিরি !

চন্দনী চমকে উঠল। বলল, যাঃ !

—যাঃ না। সত্যি এটা বারিরি !

শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে কম্ফুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

আমার প্রথমে মনে পড়ছিল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। খন্দ্‌রা মেরিয়া বলি দিতো যে সময়, জীবন্ত মানুষের মাংস খুবলে নিতো, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতো

খন্দ্‌রা, তারই নাম বারিরি। 'বারিরি' মানে বধ্যভূমি।

মেরিয়া-প্রথা বহুদিন হলো উঠে গেছে, কিন্তু বারিরি নামটি এখনও রয়ে গেছে ওদের মনে, অবচেতনে। বারিরি শব্দটার মধ্যেই কেমন একটা গা-শিরশির ভয়ের ভাব আছে।

কম্ফু বলল, একদিন রাতের বেলা এখানে এসো। দেখবে পালে পালে চিতল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে, আমলকী খাচ্ছে, আর তাদের মাথার উপর ঘুরে ঘুরে টী-টী পাখি ডেকে বেড়াচ্ছে চম্‌কে চম্‌কে হাট্রিটি — হাট্রিটি — হাট্রিটি।

॥ ৭ ॥

দুপুরে খেয়ে দেয়ে উঠতে না উঠতেই নারাণরা এসে ধরল, চলো বাবু, হাটে যাবে।

বললাম, চল।

চন্দনী বলল, আমিও যাব কিন্তু।

তারপর রত্নাকরকে বলল, বাবু তুমি যাবে না?

রত্নাকর গম্ভীর মুখে খাতাপত্র নিয়ে হিসাব করছিল। মুখ না-ফিরিয়েই বলল, নাঃ।

ক্যাপ্‌-কাটা কুলিরা তো জুকুব্‌ ক্যাপের কাজ বন্ধ করে সকাল থেকেই এসে জমায়েত হয়েছিল। নালার পাশে, পাথর সাজিয়ে উনুন করে মাটির হাঁড়িতে ভাত রেঁধে শালপাতার ঠোঙায় ওরাও ওদের খাওয়া সেরে নিয়েছিল। সকলেই যার যার গামছা কাঁধে ফেলে এখন হাটে যাওয়ার জন্যে তৈরী। এদের সকলকে ফেলে আমি যদি চন্দনী কম্ফু কালিন্দীকে নিয়ে জীপে যাই তাহলে মজা-টাই নষ্ট। তাই ঠিক হলো সকলে মিলে হেঁটেই যাবো।

রওনা হওয়া গেল সর্পগন্ধা গ্রামের দিকে। কোনদিকে যে গ্রাম তা ওরাই জানে। পাকদণ্ডী দিয়ে পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে ওরা যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।

কোথা থেকে একটা কালো কুকুর এসে জুটল আমাদের সঙ্গে।

নারাণ আর কম্ফু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, অন্যেরা আগে আগে কল্‌কল্‌ করে কথা বলতে বলতে।

নারাণকে শুধোলাম, এই কুকুরটা কার রে?

নারাণ জানেনা, তাই কালিন্দীকে শুধোলো।

কালিন্দী বলল, এটা যুধিষ্ঠিরের কুকুর।

বলেই, আগে-আগে যাওয়া যুধিষ্ঠিরকে আঙুল দিয়ে দেখালো। দেখিয়েই, স্বগতোক্তি করল, নিজে খেতে পায়না, তার আবার কুকুর পোষার সখ আছে।

নারাণ হঠাৎ দার্শনিক হয়ে গিয়ে বলল, আহা! যুধিষ্ঠির নাম, একটা কুকুর না থাকলে স্বর্গে ওর পিছু পিছু যাবে কে?

কম্ফু হাসল। বলল, তোরা যেন সব স্বর্গেই যাবি—সেই আশাতেই থাক্‌।

নারাণ দুঃখিত হলো। ও সত্যি বড় ভক্ত লোক। ওর দীনবন্ধুর ভজন শুনলেই তা বোঝা যায়। আফিং অথবা দীনবন্ধু এই দুইয়ের কাউকেই ও একটুও ছোট করে দেখেনি। দেখবেও না। তাই ওর স্বর্গ যাত্রা সম্বন্ধে কম্ফু সন্দেহ প্রকাশ করায়, ও একটু দুঃখিত হলো।

কম্ফুকে বলল, কেন যাব না? আমার কিসের পাপ?

কম্ফু বলল, তোর জন্মটাই একটা পাপ, বেঁচে থাকাটাই একটা পাপ। মানুষের শরীর পেয়েছিসই শুধু; মানুষ হস্‌নি। অনেক জন্ম এখনও তোর বিছে, কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙ হয়ে জন্মে তারপর আবার মানুষ হতে হবে—। তারপর যদি মুক্তি হয়।

নারাণ বড় সরল মানুষ। কম্ফুর কথাটা ওকে খুব আঘাত করল।

কালিন্দী কম্ফুকে শুধালো, তুই যে বড় পর-পর নাম বলে গেলি, কার পরে কি জন্ম, তুই জানিস? সাপের পরে কি ব্যাঙ হওয়া নারাণের ঠিক হবে?

কম্ফু বলল, ঠিক-বেঠিক তো যার যার কর্মের উপর নির্ভর করছে। নারাণকে নাগশাপ কামড়াবে আর কামড়েই নাগশাপ মরে যাবে, পরের জন্মে নারাণ নাগশাপ হয়ে জন্মাবে। জন্মে, ব্যাঙ ধরে খাবে। তার পরের জন্মে ব্যাঙ হবে—এমনি করেই আর কি!

পরক্ষণেই বলল, এই তোরা যে, জঙ্গলে ক্যুপ্ কাটিস কি পাশাপাশি বড় বড় সাগুয়ান গাছ দেখলেই ধড়্কে দিস? তা তো নয়। যার যার মৃত্যু লেখা আছে। তোর হাতে যে যে গাছের মুক্তি লেখা নেই, তার উপর ফরেস্ট গার্ড মার্কাই দেবে না, সেখানে তোর টাঙ্গীও পড়বে না। বুঝলি?

কালিন্দী বলল, কিছুই বুঝলাম না।

—সত্যি কথা বলতে কি, আমিও কিছু বুঝিনি।

কিন্তু কম্ফু বলল, বেশী বুঝে দরকার নেই।

হঠাৎ নারাণ বলল, আর তুই? তুই বুঝি স্বর্গে যাবি মরলেই? তাই-ই যদি হয়, তো আয় এক্ষুনি টাঙ্গীর এক কোপে তোকে স্বর্গে পাঠাই।

কম্ফু হেসে উঠল। বলল, রাগ করছিস কেন? আমার তো তোর মতো স্বর্গে যাওয়ার বাসনা নেই। আমি ঠিক করে রেখেছি আমার মুক্তি কবে হবে, কতদিন পরে; কত জন্ম পরে।

নারাণ চোখ বড় বড় করে বলল, কি ঠিক করেছিস?

কম্ফু হাসল। টাঙ্গীটাকে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে নিলো, সাপমুখো লাঠিটা ডান হাতেই রইল। বলল, দ্যাখ্, আমি রোজ প্রার্থনা করি যে, যত জন্ম জন্মাতেই হোক না কেন, জন্মাবো আমি। কিন্তু আমার শেষ জন্মে যেন ময়ূর হয়ে জন্মাই।

নারাণ বলল, কেন, ময়ূর কেন? নাগশাপ ধরে খাবি বলে? আমি কি মরে নাগশাপ হয়েও তোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো না?

কম্ফু হাসছিল তখনও। বলল, নারে বোকা! আমি একটা ময়ূর হবো, ভারী সুন্দর একটা ময়ূর। আর বনের একটা চক্রা-

বক্‌রা চিতাবাঘ, এক বর্ষার দুপুরে যখন আমি আনন্দে পেখম তুলে নাচব, ঠিক সেই সময় খপ করে ধরে খেয়ে আমাকে মুক্তি দেবে। ময়ূরের পাখার মতো শ্রাবণের কালো মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ে মেঘের গাড়ি চড়ে আমি স্বর্গে যাবো।

নারাণ চলতে চলতে কফু্র আশ্চর্য বাসনা ও কল্পনা দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে কফু্র দিকে চেয়ে রইল।

তারপরই বলল, নাঃ, তুই একটা দারুণ লোক। তোর সব ব্যাপারেরই একটা বিশেষত্ব আছে। তাই-ই তো তোকে এতো ভালোবাসি।

কালো কুকুরটা মালিকের কাছ ছেড়ে আমাদের পায়ে পায়ে চলেছে এখন।

আমি চন্দনীকে বললাম, বিড়িগড়ের সেই জুড় কুকুরটার কথা মনে আছে? সেদিনই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

চন্দনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, বিড়িগড়ের কথা থাক।

তারপরই বলল, বুঝলাম। কুকুরটাকে মনে করে রেখেছো, আর সব কেমন ভুলে গেলে, তাই না? আমাকেও তো ভুলেই ছিলে। না ডাকলে কি আর দেখা হত?

আমি ওর দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালাম।

ওরা এক সময় বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাকদণ্ডীতে ঢুকল। বড় সুন্দর পথটা। ডানদিকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে সকালে আমরা যেখানে গেছিলাম সেই মালভূমির টুপি-পরা পাহাড়টা। বাঁদিকে আবার তেমনই ধীরে ধীরে গড়িয়ে নেমে গেছে একটা ঢাল—ঢালের পরে উপত্যকা।

এখন গাছে-গাছে লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি পাতা গরমে শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। তাদের লাল আর হলুদে চতুর্দিকের সবুজের পটভূমিতে যে কী দারুণ দেখাচ্ছে। বাংলায় হলুদ লাল-সবুজের অত নাম নেই। ইংরিজিতে আছে। ইয়ালো, ইয়কার-ইয়ালো, লেমন ইয়ালো। লালের মধ্যে রেড, ক্রিমসন, পিংক, স্কার্লেট, পোস্ট-

অফিস রেড, ব্রিক-কালার, রাস্ট-কালার, আরো কত কি রঙ। রঙের সমারোহ। তার মধ্যে মধ্যে এখন জঙ্গল পাতলা হয়ে যাওয়ায় কালো কালো বড়-ছোট পাথর চোখে পড়ে, বড় গাছের কালো সাদা, ফিকে হলুদ এবং সবুজ কাণ্ড। কে এক চিত্রকর যেন নিরজনে বসে তুলে নিয়ে কী এক দারুণ জীবন্ত ছবি এঁকেছেন আদিগন্ত ক্যানভাসে। কালার-স্লাইডের মতো ক্ষণে-ক্ষণে প্রহরে-প্রহরে ছবি বদলাচ্ছে।

টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। টুঁই পাখি লেজ দুলিয়ে, লজ্জাবতী লতার মতো দেখতে যে দন্তারী পাতায় বসে ছিল এতক্ষণ সেই পাতায় হিল্লোল তুলে টি-টুঁই টি-টুঁই করে জঙ্গলের গভীরের সবুজে হারিয়ে যাচ্ছে শুকনো পাতার লালে। পাহাড়ী ময়নার বুকের লাল মিশেছে তাতে। এক রাশ আধশুকনো হলুদ পাতার মধ্যে থেকে হলুদ-কালো বসন্ত বৌরি পাখি কী উচ্ছ্বাসে সোজা উড়ে যাচ্ছে দূ-রে তীরবেগে যেন এক্ষুনি না গেলেই নয়—বিষম প্রয়োজন বুঝি তাকে এই মুহূর্তে কারোর।

আমার ভারী ইচ্ছে করে পাখি হতে। পাখি যখন উড়ে উড়ে গাছ-পালার গভীরে হারিয়ে যায়, কি পাহাড়ের অন্য পিঠে চলে যায়, কি চাঁদের মধ্যে ঢুকে যায়, অথবা যখন ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, তখন আমার বড় মন খারাপ করে। ভারী জানতে ইচ্ছে করে ওদের গন্তব্যের শেষে কি আছে? কোথায় গিয়ে ওরা পৌঁছয়?

কখনও কখনও তা দেখেওছি বা।

পাখি এক গাছকে হঠাৎ পরম ঔদাসীন্যে ছেড়ে দিয়ে অতি আগ্রহের সঙ্গে গিয়ে অন্য গাছে বসে—কিন্তু সেখানেও থাকে না বেশীক্ষণ—আবার ঔদাসীন্যে তাকে ছেড়ে অন্য গাছে উড়ে যায়। পাখির সঙ্গে তাই নারীর এত মিল দেখি। শুধু পাখির সঙ্গে কেন? সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গেই। নারী তো প্রকৃতিরই এক টুকরো। বড় রমনীয় টুকরো। পাখি, ফুল, প্রজাপতি, চৈত্রবনের হাওয়ায় ওড়া

আম-মহুয়ার গন্ধ, শীতের বনের শিশিরের ফিস্‌ফিস্‌, বর্ষার কেয়ার গন্ধ, গ্রীষ্মের তীব্র শুকনো মাটির ঝাঁঝ এইসব মিলিয়ে মিশিয়ে ভেঙে-চুরে একজন নারীকে সৃষ্টি করেন বিধাতা। হয়তো পুরুষকেও তাই-ই করেন। কিন্তু আমি তো নিজেকে দেখতে পাই, আমার পরিপূরককে পাই, প্রকৃতির হৃদয়ের, শরীরের, নিভৃততম প্রকৃতিকে দেখতে পাই – তার নারীসত্তায়।

তাই-তো চন্দনীকে বড় ভালোবেসে ফেলেছি। পুরুষ কি নারীকে ভালো না বেসে পারে? নারীর ভালোবাসা নইলে কি সার্থক হয় কোনো পুরুষ? সার্থক হয় কি কোনো নারীও। পুরুষের ভালো-বাসা ছাড়া?

চন্দনীর প্রতি আমার যে অনুভূতি তাকে নিবিড় ভালোলাগা বলাই শ্রেয় হবে। কারণ, ভালোবাসা অনেক গভীর বোধ।

কক্ষু ঠিকই বলেছিল, জীবনে বার বার ভালোবাসা যায় না; ভালোবাসা পাওয়াও যায় না। একবার দুবারই তা জোটে কারো কপালে, সারা জীবনে।

এত কষ্ট: আর্থিক, মানসিক, সাংসারিক, সামাজিক, তবু আশ্চর্য! ভালোবাসা ঠিকই জেগে থাকে মানুষ-মানুষীর বুকে। তাদের মানুষ হতে, মানুষ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি বড় বোকা মানুষ। ভালো-বাসা, এই প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, চন্দনীর প্রতি ভালোবাসা, নারাণ, কক্ষু, কালিন্দী, চন্দ্রকান্ত এমনকি রত্নাকরের প্রতি ভালো-বাসাও আমাকে বড় আচ্ছন্ন করে। ভালোবাসার পাত্র আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ভালো যে বাসতে পারি, কাউকে, কিছুকে; এই বোধটাই আমাকে বড় মুগ্ধ করে তোলে।

এত ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, প্রতি পদে পদে, শহরে, বনে, তবুও মনে মনে মানুষকে না ভালোবেসে পারি না। মানুষকে ভালোবাসতে পারার অপারগতা সে তো মানুষের প্রতি অবিশ্বাসেরই নামান্তর।

নারাণ ও কক্ষুরা পরজন্মে যা হতে চায় তাই-ই হোক। মুক্তি পেতে চায়, পাক। আমি যেন আবার মানুষ হয়েই জন্মাই, আমার

এই সুন্দর, বড় সুন্দর দেশে, আবারও যেন এই প্রকৃতিতে, নিরুপদ্রব গভীর ভারতীয় শান্তিতে বড় হয়ে উঠি, তারপর এই দেশেরই কোনো সাধারণ শ্যামলা নরম নিভৃত নারীর কবোষ্ণ কবুতরী স্তনে মায়ের স্নিগ্ধ শ্বেতা হাঁসী স্তন থেকে স্থানান্তরিত হই। আবারও, আমের বোলের গন্ধ-ভরা এমনই বিলোল বসন্তের বনে।

মাঝে মাঝে আমার গর্ব হয়। আমি যে ভারতবর্ষেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি, এখানেই পড়াশুনা করেছি আর পড়াশুনো করেও যা শেখা যায় না তা শেখার সাধ এবং দেখার চোখ দিয়ে এ-দেশকে দেখেছি সেই জন্যে।

একটা চড়াই পেরিয়ে, একটা উৎরাই নেমে, কিছুটা সমতলে গিয়েই দূর থেকে সর্পগন্ধা গ্রামের হাট চোখে পড়ল। একটা সেগুন বনের ভিতর অল্প একটু জায়গা নিয়ে হাটটা। গাছতলায় অর্জুন পাতা বিছিয়ে দোকানীরা বসেছে। কোনো জায়গায় মোটা চাল। ডাল, শুধু মুসুর। শাড়ি গামছা। নানারঙা কাঁচের চুড়ি। আয়না। দুর্গার পট, জগন্নাথের পট। কয়েকটা এঁচড়, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ, আদা, শিমূল মুল, কন্দমূল, নানারকম জংলী মুল। মাটির হাঁড়ি-কলসী আফিং-এর গুঁড়া। মোটা-দানার নুন। গুড়। আলতা, সিঁদুর।

এই পাহাড়ী গাঁয়ের চারপাশের লোকেরা এত গরীব যে মেয়েদের রূপোর গয়না, বা পেতলের বাসন বা চুল-বাঁধা রিবন কিছুই এই হাটে জমেনি। কিন্তু সিঁদুর এবং আলতা উঠেছে। বন-পাহাড়ের মেয়েদের বোধহয় এর চেয়ে বড় আভরণ নেই। হয়ও না।

এক পাশে একটা বিড়ি-বড়া ও গুল্‌গুলার দোকান। ভাঁটিখানা। শালপাতার দোনা ছড়ানো ছিটানো। বড় একটা বটগাছের একপাশে একজন নাপিত বসে একজন লোকের বগল কামাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে। অন্যদিকে সবুজ শাড়ি আর গোলাপী জামা এবং কালো রিবন মাথায় দিয়ে একজন মাঝবয়সী দারিয়ানী একটা পাথরের উপর বসে আছে।

আমি কম্ফুকে ডেকে বললাম, ওদের সকলকে বলে দাও যে, আমি প্রত্যেককে পেট ভরে গুল্‌গুলা আর বিড়ি-বড়া খাওয়াব এবং

খাওয়ার পরে বিড়ি—যদি কেউ না ভাঁটিখানায় যায়।

ওরা সকলে শুনে হৈ হৈ করে উঠল।

নারাণ বলল, আফিং কোনো নেশা নয়। তা বাবু, আমি তো ভাঁটিখানায় যাই না বহুবছর। আফিং কিনলে কি তুমি আমাকে খাওয়াবে না?

আমি বললাম, নারাণ হচ্ছে নারাণ। নারাণের সঙ্গে কার তুলনা? নিশ্চয়ই খাওয়াবো।

আমি চন্দনীকে দশটা টাকা দিলাম। বললাম, তোমার যদি কিছু কেনার থাকে কেনো।

চন্দনী আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকালো যে, আমার বুকটা বড় নরম হয়ে গেল। বিয়ে না করেও, সহবাস না করেও বুঝতে পারলাম সেই মুহূর্তে যে দাম্পত্য সম্পর্ক কত গভীর ও মিষ্টি সম্পর্ক। এ দেশে। এখনও।

এই টাকাটা আমার দেওয়া এবং ওর গ্রহণ করার মধ্যে এমন একটা বোঝাবুঝি ছিল যে, সেটা ভাষায় প্রকাশের নয়। প্রকাশের হলেও, সে ভাষা আমার নেই।

দু-পা এগিষে গিয়ে, গ্রীবা বেঁকিয়ে চন্দনী একবার আমার দিকে ভালোবাসায় জরজর চোখ তুলে চাইল। একটু হাসল। শেষ বিকেলে গাছ-গাছালির আড়াল ছিঁড়ে এক ফালি হলুদ-সোনা আলো এসে ওর মুখে পড়েছিল। আমার চন্দনী জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল।

ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে-যাওয়া চন্দনীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো চাকরী পাওয়ার দিনের পর থেকে এত খুশী আমি কখনও হইনি। খুশীতে আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠলাম। সকলকে ডেকে বললাম, আয়রে, তোরা বিড়ি-বড়া আর গুল্‌গুলা খা।

এই বিড়ি-বড়া—বিড়ি (কলাই) ডাল দিয়ে তৈরী করে ওরা। দক্ষিণ ভারতীয় বড়ার মতোই প্রায়। উড়িষ্যার সব অঞ্চলেই এর খুব চল্। যে যার হাট সেরে গুল্‌গুলা বিড়ি-বড়ার দোকানের সামনে

এসে ভীড় করল। হৈ হৈ করে সকলে খেতে লাগল। দোকানী ও তার ছোট ছেলে গলদঘর্ম হয়ে গেল হঠাৎ এত খদ্দেরের ভীড়ে। এই মুহূর্তে ওদের দশটা করে হাত থাকলে খুশী হতো ওরা খুব।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো। দুটো মোষের গাড়ির মালিক মোষগুলোকে খুলে রেখেছিল। এখন মোষ জুতে একজন চাল-ডাল বস্তাবন্দী করে তুলতে লাগল। অন্যটাতে মাটির হাঁড়ি কলসী। ওরা বোধহয় দূর থেকে এসেছে। আলো থাকতে থাকতে গ্রামে পৌঁছতে চায়।

দারিয়ানী মেয়েটির কাছে একজনকেও যেতে দেখলাম না। ওর আজ হাট করার পয়সাটুকুও রোজগার হলো না। আমি ভাবছিলাম, কোনো খদ্দের পেলেও তাকে নিয়ে ও যেতো কোথায়? কালিন্দীকে শুধোলাম সে কথা। কালিন্দী হেসে ফেলল আমার অর্বাচীনতায়। বলল, এই জঙ্গল-পাহাড়ে ঘর-বাড়ি দিয়ে কি হবে বাবু? দেখতেন খদ্দের পেলেই চলে যেতো গাছ-গাছালির ওপাশে, পাথরের আড়ালে, কি নালার ছায়ায়। এখানে ঘর কোনো সমস্যা নয়। লোকই সমস্যা; পয়সা সমস্যা।

আমি কালিন্দীর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দেখি চন্দনী গিয়ে মেয়েটার কাছে দাঁড়াল। মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে চন্দনীকে কি সব বলল।

মেয়েটার মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছিল। দেখলাম চন্দনী তার হাতে কি যেন দিলো। মেয়েটার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেয়েটা দৌড়ে এসে ভাঙা হাটে যা পারে তাই তাড়াতাড়ি কিনে নিলো।

চন্দনী আস্তে আস্তে আমার কাছে ফিরে এলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। চন্দনী মুখ নামিয়ে নিলো। তারপরই আমার মুখে প্রসন্নতা দেখে মুখ তুলে চাইল। দারুণ এক কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে ওর কালো মুখটি কাজললতার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি সবাইকে বললাম, খাও খাও। বিড়ি-বড়া খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে নইলে।

নারাণ বলল, বাবু, কম্ফুর বউ গুল্‌গুলা খেতে খুব ভালোবাসে। কম্ফুকে ওর বউ ছেলের জন্যে একটু কিনে দাও।

কম্ফু লজ্জা পেল। নারাণকে বলল, ভাগ্।

আমি বললাম, নাও, কম্ফু, গামছায় বেঁধে নাও।

কম্ফু বলল, বউটা বড় পেটুক। ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। ধুলো-বালি গোবর-চ্যবনপ্রাশ যা হাতের কাছে পায়, তাই-ই খায়।

এই ক'দিনে কম্ফুর বউকে দু'একদিন ছাড়া দেখতে পাইনি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। গায়ের রঙ ফর্সা। নাকে পেতলের নথ। পরনে গেরুয়া-শাড়ি—এখানের মেয়েরা যেমন পরে। শুধুই শাড়ি; কোনোরকমে পেঁচানো। আর কোনো জামা-কাপড় নেই। মাথায় একরাশ কালো চুল। বিনা তেলে, বিনা চিরুনিতে রুক্ষ হয়ে গেছে। কিন্তু শরীরের বাঁধন এখনও খুব ভালো। মনে হয় কম্ফুর চেয়ে বয়সে কম করে পঁচিশ-তিরিশ বছরের ছোট হবে। নাম সীতা। ওকে কথা বলতে দেখিনি কখনও। এমন কি কম্ফুর সঙ্গেও না। ওকে এমনিতেও ঝুপরির বাইরে বড় একটা দেখা যায় না। শুধু দুপুরবেলা সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, ক্যাম্পের উপর একটা অলস মন্থরতা নেমে আসে যখন, কম্ফু যখন খল-নড়া হামন-দিস্তা এসব নিয়ে নানারকম গাছপাতা শিকড় ছাল থেকে, রোদে পা-ছড়িয়ে বসে ওষুধ বানায়, তখন ওর বউ কম্ফুর দিকে পিছন ফিরে বসে অলস উদাসীনতায় নিজের মাথার উকুন মারে। চন্দনীর মতো নয়। নোংরা, অপরিষ্কার। চন্দনী তো আদিবাসী উপজাতি। ওরা তা নয়। কম্ফুর বউকে দেখে মনে হয়নি কখনও যে, ও-ও কিছু ভালোবাসতে পারে, ওরও পছন্দ অপছন্দ, দাবী-দাওয়া বলে কিছু থাকতে পারে। তাই-ই, ও যে গুল্‌গুলা খেতে ভালোবাসে একথা শুনে আমার একটা খবরের মতো খবর বলে মনে হয়েছিল।

কক্ষু যখন ওর গামছাতে গুলগুলা আর বিড়ি-বড়া বেঁধে নিচ্ছিল তখন পর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওর বউ-ছেলেকে বড় ভালো-বাসে কক্ষু।

এবার ফেরার পালা। সকলেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেছে। আমি আর চন্দনী পিছন পিছন। যদিও আলো আছে এখনও যথেষ্ট কিন্তু এখনই চাঁদ উঠে পড়েছে সূর্য ডোবার আগেই। ধ্রুবতারাও উঠেছে পশ্চিমাকাশের নাকে সবুজাভ দ্যুতিময় হীরের নথের মতো।

নারাণ বলল, বাবু দলছাড়া হয়ো না।

—কেন? আমি শুধোলাম।

—না। ছবি নায়েক আর তার দলবল। মেয়েরা আজকাল ভয়ে হাটে আসে না একা। আমাদেরও ভয় করে। কখন যে কাকে ধরে মার-ধোর করে ঠিক-ঠিকানা নেই। বড় ভয় করে বাবু। জঙ্গলের বাঘকেও এত ভয় করে না।

আমি বললাম, চিন্তা নেই কোনো। তুই এগো।

চন্দনীর হাতে তখনও একটা বিড়ি-বড়া ছিল। আমাকে ভেঙে আধখানা দিলো।

আমি বললাম, তুমি খাও। আমি খাবোনা।

ও বলল, কেউ আদর করে কিছু দিলে তা না বলতে নেই।

কিছু না বলে আমি আধখানা বিড়ি-বড়া হাতে নিলাম।

বিড়ি-বড়াটা খেয়ে গাছের পাতা ছিঁড়ে তাতে হাত মুছে চন্দনী বলল, তুমি রাগ করলে, না? আমি তোমার টাকাটা ঐ মেয়েটাকে দিয়ে দিলাম বলে?

আমি বললাম, রাগ করব কেন? টাকাটা যখন থেকে তুমি হাতে নিয়েছ, তা তো তোমারই হয়ে গেছে। ওতে আমার কি অধিকার?

চন্দনী বলল, জানো, মেয়েটা নীচু জাতের। ও থাকে এক ব্রাহ্মণ-দের গাঁয়ে। যেখানে যে-কোনো কাজ পেলে, ধান-ভানার, ঘরের কাজের, ওর দিন চলে যেতো, কিন্তু ছোটো জাত বলে কাজ দিতে চায়নি কেউ। ওর স্বামীর বড় অসুখ; বুকের ব্যারাম, সারছে না।

তাই গত তিনবছর হলো এই করে কোনোরকমে চালাচ্ছে।

তারপর বলল, ওর বয়স হয়ে গেছে। তাছাড়া দেখতেও যে খুব একটা ভালো তাও নয়। বেচারীর খুবই মুশকিল।

আমি কম্ফুকে ডাকলাম।

কম্ফু থেমে পড়ল চলতে চলতে। ওর দল ওকে ছাড়িয়ে উৎরাইয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা গিয়ে ওর কাছে পৌঁছতেই ওকে বললাম, দেখি তুমি কেমন বদ্যি। একজন রুগীকে সারাতে পারো?

—কোন রুগী?

কম্ফু ভুরু তুলে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

আমি বললাম রুগীর কথা।

কম্ফু খুব অসন্তুষ্ট হলো। আমার দিকে ও চন্দনীর দিকেও রোষকষায়িত চোখে চেয়ে বলল, ও ছোট জাত। ওর চিকিৎসা আমি মরে গেলেও করব না।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, কম্ফু, বদ্যির আবার জাত-বিচার আছে নাকি? ভগবান তোমাকে যে বিদ্যা দিয়েছেন তা তো অন্যকে দেননি। তুমি সব অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তুলবে, তবে না তোমার বিদ্যা সার্থক।

তারপর বললাম, রুগীতো রুগীই। রুগীরও আবার জাত থাকে কি?

কম্ফু শ্লেষের সঙ্গে হাসল।

বলল, তোমার অনেক জ্ঞান বাবু, তুমি বড় শহরের লেখাপড়া জানা লোক। তোমার বিদ্যা নিয়ে তুমি থাকো। আমরা জাত-বেজাত, জন্মা-বেজন্মা মানি।

আমি বললাম, তুমি যা চাও সব দেবো। যাবে?

কম্ফু বলল, আমি বদ্যি কম্ফু! আমাকে লোভ দেখিও না। আমি আমার জ্ঞান-গম্যি নিয়ে বেঁচেছি, বাঁচব। তোমার টাকার লোভে আমি জাত খোয়াবো না।

কম্ফু এই বলে হন্‌হন্‌ করে আমাদের ফেলে এগিয়ে গেল।'

চন্দনী আমার পাশে গাঢ় হয়ে এসে বলল, লোকটার বউ যে দারিয়ানী—সেই জন্যেই ও রাজী হলো না। তোমাকেও আসলে ওরা সহ্য করেনা—নেহাৎ তুমি বলেই কিছু বলে না। আমার কারণে তোমার এত অপমান আমার বড় লাগে। তুমি আমাকে মেরে ফেলো। না মারতে পারলে, যেখানে ইচ্ছে ফেলে রেখে ফিরে যাও। আমি একটা হতভাগী।

আমি ওর হাতটা হাতে নিলাম।

বললাম, তুমি চুপ করো তো!

আমরা সবচেয়ে পিছনে আসছিলাম। যখন বড় রাস্তায় এসে পড়লাম তখন চাঁদটা পাহাড়ের বাধা ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। দিনের শেষ আলোর দিগন্তে বনজ্যোৎস্নার প্রথম আলো মাখামাখি হয়ে এক আশ্চর্য আলোর না-রাত, না-দিন সৃষ্টি হয়েছে। না-প্রদোষ, না-উষা, একে কি বলে ডাকব?

ক্যাম্পের কাছে যেতেই একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। তার মধ্যে কম্ফুর গলাই সবচেয়ে জোর।

রত্নাকর লুঙির ওপরে শার্ট চড়িয়ে, প্লাস্টিকের জুতো পরে ঘড়ি লাগিয়ে, পকেটে ফাউন্টেনপেন গুঁজে কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে সামনে আগুন করে। কুলিরা সব তাকে ঘিরে আছে। ভিড়ের মধ্যে কম্ফুর বউ এবং একটি অল্পবয়সী লোক। দেখে মনে হয়, কাঠ-কাটা কুলি।

কম্ফুর বউ-এর গলা শুনলাম এই প্রথম। গলাটা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কর্কশ। চেহারার সঙ্গে গলার কোনোই মিল নেই। সে রত্নাকরের দিকে চেয়ে আঙুল নাড়িয়ে বলছিল, বলো ম্যানেজারবাবু! আমি কি বলদ? কম্ফু কি আমাকে কিনে রেখেছে?

রত্নাকর, জজ সাহেবের মতো বাহ্যিক গম্ভীরতা বজায় রেখে নৈর্ব্যক্তিক চোখে চেয়ে ছিল কম্ফুর বউয়ের মুখের দিকে। মুখে কোনো কথা বলছিল না। তখন ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, ওর

বয়সের তুলনায় যথেষ্ট বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হয়েছে রত্নাকর।

কম্ফু বলল, এই সীতা ত্থাখ্, একবার চেয়ে ত্থাখ্, তোর জন্যে গুল্‌গুলা এনেছি। বিড়ি-বড়া এনেছি, খাবি না? তুই কত ভালোবাসিস।

সীতা অর্থাৎ কম্ফুর বউ বলল, না।

তারপর বলল, বুড়ো বস্তি! আমি কি ছাগলাত্ত না চ্যবনপ্রাশ? তুই তো আমার বাবার বয়সী—মেয়ের আদরটুকুও তো দিতে পারতিস? তুই কেবল নিজেকে নিয়ে থাকলি, তোর নিজের বিদ্যা, তোর কর্কট রোগের ওষুধ, তোর জড়া তেল, পুটকাসিয়ার গোড়া আর হাড়-কঙ্কালির ছাল। তুই একটা জোয়ান মেয়েকে কি দিয়েছিস্? শাড়ি? পেতলের মল? আদর? তোর কী আছে আমাকে রাখবার মতো?

পাশের ছেলেটি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। শক্ত-সমর্থ কালো চেহারা, মাথার চুল পাতলা, ছেলেটির কাঁধে একটি ছেঁড়া ঝোলা।

কম্ফু বিড়বিড় করে বলল, কুশ? কুশের কি হবে সীতা? তোর কুশকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

সীতা কর্কশ গলায় বলল, কুশকে ছেড়ে থাকব কোন দুঃখে? ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—কুশকে নিয়ে যাসনা সীতা, আমি তাহলে মরে যাবো। ও আমার ছেলে। ওকে রেখে যা।

সীতা ওর উলঙ্গ ধুলোমাখা ছেলের হাত ধরে চীৎকার করে বলল, তবে সবাইকে শুনিয়েই বলি—শুনুক সবাই—কুশ তোর ছেলে নয়, কুশের বাবাকে এই ত্থাখ্, দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। চেয়ে ত্থাখ্ ভালো করে।

কম্ফুর চোখটা দপ করে জ্বলেই নিভে গেল।

আমি ভাবলাম, কম্ফু ওর কাঁধের টাঙ্গী দিয়ে বুঝি দুজনকেই কেটে দু-ফালা করে ফেলবে এক্ষুনি। কিন্তু কম্ফু কিছুই করল না। মুখ নামিয়ে নিলো। দেখলাম, ওর দু চোখে জল।

কম্ফু বলল, তুই তাহলে এতদিন এতবছর আমাকে ঠকিয়ে এসেছিস ?

—এসেছি। নির্লজ্জ দম্ভভরে বলল সীতা। একটু থেমে বলল, বেশ করেছি !

তারপর আর কথা না বলে সীতা সঙ্গের লোকটাকে বলল, চলো, যাই আমরা।

বলেই, ছেলের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান লাগাল।

ছেলেটা, যার নাম এক্ষুনি প্রথম জানলাম, কুশ, ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। ধুলো খেয়ে, ছাই খেয়ে, লাথি খেয়ে, ঝাঁটা খেয়েও যে গলায় এত জোর কি করে হলো দু বছরের ছেলেটার, তা ভেবে অবাক হলাম আমি।

সীতা হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

নারাণ বলল, সীতা বোন, এই রাতে কোথায় যাবি ?

সীতা বলল, ছবি ঠিকাদারের কাছে। কামীনের কাজ করব। ভাল শাড়ি পরব, ভাল খাব। এখানে আর নয়।

ছেলেটার হাতে আর এক হ্যাঁচকা টান লাগাতেই ছেলেটা বাপ্পা, ও বাপ্পা বলে কাঁদতে লাগল। মায়ের সঙ্গে অনিচ্ছায় যেতে যেতে সমানে বাবা গো ও বাবা, বাবারে-এ-এ-এ বলে কাঁদতেই থাকল ছেলেটা। মুখটা ফিরিয়ে রইল কম্ফুর দিকে।

যতজন লোক ওখানে ছিল সকলেই নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে ছিল। কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। রাতের নিস্তব্ধতা, ঝিঁঝির ডাক, সমস্ত পরিবেশকে একটি দু বছরের সরল, ধুলোমাখা শিশুর গলার বাবা গো, ও বাবা—বাবা-আ-আ-আ-আ রব অনেকক্ষণ অবধি মথিত করে রাখল।

কুশের চিৎকার যখন আর শোনা গেল না, শিশির পড়ার শব্দ যখন তার কচি গলার স্বরকে ঢেকে দিলো ; তখন প্রথম কথা বলল রত্নাকর।

বলল, কম্ফু, শেষে তোর বউ একটা ছোট জাতের ছেলের সঙ্গে

পালালো। তার ছেলে পেটে ধরল। তুই একটা পাঁঠা! . .

আমি রত্নাকরকে মেরে বসতাম, কিন্তু সামলে নিলাম। এরা বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠোর, বড় কুপমণ্ডুক এরা। আবার এরাই কখনও কখনও বড় দয়ালু, ভালো ; মহৎ।

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি চন্দনীকে নিয়ে ঘরে গেলাম। একটু পর হঠাৎ একটা বুক-ফাটা চিৎকার শুনলাম। সে হাহাকার বড় মর্মভেদী।

কিন্তু পরক্ষণেই চুপ করে গেল কম্ফু। একটি ক্ষণিক কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তস্বর। তবুও অনেকক্ষণ সেই স্বর পাহাড়ে জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল।

জানি না, এখন অনেকদূরে চলে-চাওয়া একটি নিষ্পাপ সরল শিশু, কম্ফুকে যে প্রথম চোখ মেলে এ পৃথিবীতে বাবা বলে জেনেছিল, যাকে ভালোবেসে ও যার ভালোবাসা পেয়ে পৃথিবীতে অপত্য স্নেহের স্বাদ পেয়েছিল, সে বড় হয়েও তার এই নকল বাবাকে মনে রাখবে কিনা।

হয়ত রাখবে না।

কিন্তু কম্ফু বুঝি তার নকল ছেলেকে কখনও ভুলতে পারবে না। কম্ফুর তো আর কোনোও অবলম্বন রইল না : কোনো গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় জড়ি-বুটী কোনো কিছুই রইল না আর জঙ্গলের এই মহান বস্তির। আঁকড়ে ধরার মতন। ওর বুকের সব ভালোবাসা অবিশ্বাসের হামলদিস্তায় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে সীতা।

কুশ যে তার কেউ নয় একথা জানলে ও কুশকে ভালোবাসতো না হয়ত, কিন্তু ভালোবেসে ফেলার পরে নকল জানতে পেরেও কি সে ভালোবাসা ফিরিয়ে নিতে পারবে কম্ফু? কম্ফুই জানে।

মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে সেদিন আর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। চন্দনীও খেলো না।

নালায় হাত-মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে এসে ক্যাম্পের বাইরে কাঠের গুঁড়িতে বসেছিলাম।

কালিন্দী, যুধিষ্ঠির ও আরও ক্যাপ্-কাটা কুলীরা আজ সকালে ক্যাম্পের আশ-পাশেই থেকে যাবে রাতের মতো। এদিকে-ওদিকে ওরা পাথরের উনুন বানিয়ে আগুন করে রান্না চড়িয়েছে। ভাত ফোটার গন্ধ, তার সঙ্গে আফিং-এর গুঁড়োর গন্ধ মিশে অদ্ভুত এক গন্ধ বেরোচ্ছে। সে গন্ধ মিশে গেছে রাতের বনের গায়ের গন্ধের সঙ্গে।

ওরা সকলে বলছিল যে, সীতার এই চলে যাওয়ার পিছনেও ছবি নায়েকের হাত আছে। এই বন-পাহাড়ে যা কিছু অনৈসর্গিক অশুভ ঘটনা ঘটে সবকিছুর পিছনেই তার হাত আছে।

ছবি নায়েক এ জঙ্গলে স্বৈরাচারের প্রতিমূর্তি। ছবি নায়েক ওদের কাজ করিয়ে টাকা দেয় না; মারধোর করে। যে-কোনো মেয়েকে সে চায়, নিয়ে যেতে। কোনো চক্ষু লজ্জা, ভয়, বিবেক কোনো কিছুই নেই লোকটার।

চাঁদের আলোয় ওদের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বড় করুণা হলো আমার। যদিও ওরা ছবি নায়েকের কাছে কাজ করে না; তবুও যেন সর্বক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সকলে। ওদের ম্যানেজার রত্নাকরের মধ্যে ওরা আর একজন ছবি নায়েকের বীজ দেখতে পায়, বলেই কি?

ওরা নিজেদের মধ্যে পুটুর পুটুর করে অস্ফুটে কি সব কথা বলছে শোনা যায় না তা। ওরা যেন কত দূর থেকে, অবচেতন থেকে কথা বলছে। ওদের পুটুর পুটুর কথা ভাত ফোটার পুটুর পুটুর আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

নারাণ ঝুপড়ীর সামনে বসে যথারীতি ওর গান শুরু করেছিল।

"দয়া করো দীনবন্ধু আজ যাউ শুভ দিন।"

দীনবন্ধুকে যতই আকুল হয়ে ডাকুক না কেন নারাণ, সব দিন কারোই শুভ যায় না। আজকের কম্ফুর দিনের মতো।

হঠাৎ কচ্ কচ্ চক্ চক্ শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি, যুধিষ্ঠিরের কালো কুকুরটা কম্ফুর ঝুপড়ির সামনে খুব মনোযোগ দিয়ে মুখ নীচু করে কি যেন খাচ্ছে।

উঠে গিয়ে দেখি, গুল্‌গুলা আর বিড়ি-বড়া। কম্ফু তার কোঁচড় শূন্য করে সব ঢেলে দিয়েছে ধুলোর মধ্যে, কুকুরের সামনে।

কিন্তু কম্ফু কি কোঁচড়ে করে শুধু গুল্‌গুলা আর বিড়ি-বড়াই এনেছিল তার ভালোবাসার স্ত্রী আর সন্তানের জন্যে? ওর কোঁচড়ে ওর বুকের পাঁজরের মধ্যে তাদের জন্যে আরও যা ছিল, যা দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় না; সেই বোধগুলিকেও কি ধুলোয় ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো যায়?

বেচারী কম্ফু! আমি ডাকলাম, কম্ফু।

কোনো সাড়া পেলাম না।

আমি আবারও ডাকলাম, কম্ফু!

তবুও সাড়া দিলো না কেউ।

তখন আমি ঝুপড়ির কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। উঁকি মেরে দেখি, ঝুপড়ি ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে।

ফিরে এসে নারাণকে শুধোলাম, কম্ফু কোথায় গেছে জানে কি না!

নারাণ গান থামিয়ে বলল, জানে না। অন্য কেউও জানে না। এত রাতে কোথায় গেল লোকটা একা একা জঙ্গলে?

কাক-জোৎস্নায় ভরে গেছে বন-পাহাড়। একটা কোকিল কুহু কুহু করে পুলক ভরে ডেকে চলেছে। এতদিন কোকিলের ডাক শুনিনি একেবারে। বসন্ত এসে গেছে সমারোহে। তাকে স্বাগত জানাচ্ছে কোকিল। বনে-পাহাড়ে বসন্ত একটু দেরীতে আসে—শীতও যায় দেরীতে। একটা কোকিল বারিরির দিক থেকে ডাকছে আর একটা সাড়া দিচ্ছে আরো নীচ থেকে। আরো কত পাখি ডেকে ফিরছে। দোল পূর্ণিমার আগের রাতে সমস্ত প্রকৃতি বুঝি হোরি-খেলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কাল কিন্তু এখানে কারো ছুটি নেই। জঙ্গলের মধ্যের এই ছায়ানিবিড় খোলে ক্যালেণ্ডারের দাম নেই কোনো, সময়েরও নেই, আইন-কানুন, ইউনিয়ন, কিছুরই নেই। এখানে একদল কাজ করে, একদল কাজ করায়, আর একদল এই

সমস্ত ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করে নেপথ্যে থেকে। যাদের টাকা আছে এবং আরও টাকা রোজগারের উৎসাহ আছে।

কিন্তু এই লোকগুলোর কোনো বিকার নেই। এই নারাণ, কালিন্দী, যুধিষ্ঠিররা। এরা অদ্ভুত মানুষ। এই কুপমণ্ডুক শান্ত অথচ বড় দুঃখের জীবন নিয়ে এদের কোনো অভিযোগও নেই। শুধু আফিংই নয়, সমর্পণের, প্রতিবাদহীনতার মর্‌ফিনে এরা এক দারুণ ঘোরের মধ্যে আছে। এক ধরনের নিরীহ জংলী জানোয়ারের মতো। আশ্চর্য লাগে ভাবলে ; এদের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত দীনবন্ধুর উপরে ছেড়ে দিয়ে আফিং-এর গুঁড়োর সঙ্গে চাল সেদ্ধ করে একটু নুন দিয়ে খেয়ে এরা দিব্যি হাসিমুখে বেঁচে রয়েছে। এদের খুব কাছ থেকে দেখার পরে সবচেয়ে বেশী যা আমাকে অবাক করে তা হলো এদের অভাববোধের অভাব। এটা একদিকে যেমন খারাপ, আবার অন্যদিকে ভালো নিশ্চয়ই। এরা এক মেরুর, আমরা অন্য মেরুর। শহরের আমরা অভাববোধকে নিরন্তর বাড়াতে বাড়াতে অভাববোধ আর প্রাপ্তির, সুখহীনতা ও সুখের মধ্যে ব্যবধানটা দিনের পর দিন বাড়িয়েই তুলেছি। সুখের পাখিকে তাই আর কিছুতেই মনের খাঁচায় ধরে রাখতে পারছি না। নারাণ আমার চেয়ে কত গরীব, কত হতভাগা, ও হয়তো মনুষ্যের জীবের পর্যায়ের জীবনই যাপন করে, কিন্তু ওর মধ্যে আবার একধরনের মনুষ্যত্ব ও মহত্ব সর্বক্ষণ প্রতিভাত দেখি যা আমার মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত বলেই জানি আমি।

যেসব সুখের পিছনে আমরা শহুরে শিক্ষিত লোকেরা ঘুরে বেড়াই, সেইসব সুখের প্রয়োজন বোধহয় আমাদের নিজেদেরই তৈরী করা। তার অনেক কিছুই না থাকলেও অনায়াসে হয়তো দিন চলে যেতো আমাদের। অথচ অন্য দশজন যা করে. যা চায়. আমাদের তাই-ই করতে হয়, যা চায়, তাই-ই চাইতে হয়। তাদের মতো করে টাইয়ের নট্‌ বাঁধতে হয়, ক্লেয়ার বানাতে হয়, টি-ভিও কিনতে হয় রাজনীতির মিথ্যুক ও কুদৃশ্য নেতাদের এবং চিড়িয়াখানার

কচ্ছপ দেখার জন্যে। প্রতিবেশী ট্যাক্সি চড়লে আমাকেও চড়তে হয়, গাড়ি কিনলে গাড়িও, না পারলে ঈর্ষার অনলে বুক জ্বলে যায়।

অথচ এসব অনেক কিছু ব্যতিরেকেই দিব্যি চলে যেতো দিন। অনেক অবকাশ থাকতো, যে যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পারতাম, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অনুসারে এক একজন সম্পূর্ণ নিটোল স্বয়ংস্বরূপ ব্যক্তি হয়ে উঠতেও বা পারতাম।

কিন্তু জীবনের মাঝামাঝি এসেও কিছুই হওয়া হলো না। দৌড়ে দৌড়ে জুতো ক্ষয়ে গেল, পড়ে পড়ে চোখ ম্লান হলো, উপরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড়ে ব্যথা জন্মালো, ঈর্ষার পরশ্রীকাতরতার গরলে এককালীন অনাবিল মনের পদ্মরঙা অমৃত গরলে নীলাভ হয়ে উঠল —তবু চাওয়া ফুরোলো না ; লোভ ফুরোলো না।

ওরা একসঙ্গে গোল হয়ে বসে গল্প করছিল। নারাণটা ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে পাতিহাঁসের মতো হাসছিল। হাসতেও পারে ওরা। একটা বড় গামছা দু'ভাগ করে পরে ও গায়ে দিয়ে, খালি গায়ে, খালি পায়ে আয়ের ঘরে সামান্য কিছু মুদ্রা ও সম্পত্তির ঘরে একটি নিখুঁত গোলাকার শূন্য ভরে দিব্যি হেসে খেলে গান গেয়ে দীনবন্ধুর ভরসায় কেমন চালিয়ে যাচ্ছে এরা। কূপমণ্ডুকতাকে লোকে খারাপ বলে বটে—কিন্তু সুখী হবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় বোধহয় আর দুটি নেই।

কাল যাত্রা হবে সর্পগন্ধা গাঁয়ের কাছের মাঠে। নীলমণি চম্পতিরায়ের যাত্রার দল সেখানে রাজনন্দিনী যাত্রা করবে। কাল সকালেই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে বন-জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ওরা যাত্রা দেখতে যাবে। সারারাত যাত্রা দেখে আবার ভোরে ভোরে ফিরে এসেই কাজে লাগবে।

এই বাসন্তী পূর্ণিমার নেশাটা বড় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমায়। এইজন্যেই জঙ্গলে আসি না। আসতে চাই না আমি। এলেই কেমন নেশা লাগে। শহরের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে শহরকে বড় গোলমেলে, নোংরা, দীন, ছোটমনের জন্তুদের বাসস্থান বলে মনে হয়। এখানে এলেই কেন এখানে এসেছিলাম, সে কথা ভুলে যাই,

একদিন যে ফিরে যেতে হবেই, ভুলে যাই সে কথাও। ফিরে যাওয়ার কথা মনে আনলেই কান্না পায়।

একা বসে ভাবছিলাম যে, চন্দ্রকান্তর কারণেই চন্দনীর বোঝা চাপল আমার ঘাড়ে। বোঝাই বলি। যা সত্যি, তাকে সত্যি করে বলাই ভালো। যার স্ত্রী সে তাকে বেমালুম অস্বীকার করে দিব্যি টঙে চড়ে দিন কাটাচ্ছেন, আর আমি কেন মরতে এ ঝামেলা কাঁধে নিই! আমি না হয়ে অন্য কেউ হলে চন্দনীর শরীরটাকে এক পাথরবাটি ক্ষীরের পায়েসের মতো চেটেপুটে খেয়ে বাটিটি ছুঁড়ে ফেলে বনে, ফিরে যেতো মুখ মুছে হয়তো। কিন্তু আমি কি, তা চন্দনী যেমন জানে, তেমন জানেন চন্দ্রকান্তও। আমি একটা আকাট ইডিয়ট্। হামাগুড়ি দেওয়ার পরবর্তী সময় থেকেই পায়ে আঠা নিয়ে ঘুরছি আমি। যেখানে যাই, সেখানেই ফেঁসে যাই, সেঁটে যাই; পালিয়ে আসতে পারি না।

ঠিক করলাম, কাল পূর্ণিমার রাতে আরেকবার চন্দ্রকান্তর কাছে যাবো—গিয়ে শেষবারের মতো চন্দনী সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে চন্দনীকে নিয়ে গিয়ে বিড়িগড়েই ছেড়ে দিয়ে আসবো।

আসলে আমি শহরের কীট। পিচ রাস্তার হাইড্রেন্ট-এর তেলাপোকার মতো। ময়লা, ধুলো বীজাণু ও ডিজেলের ধোঁয়ার মধ্যে আমার প্রোটিন, ভিটামিন, সব। আমি কেন বনের নির্মল সুদৃশ্য প্রজাপতি হতে পারবো? সবাই কি সব হতে পারে? আমি অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন, সংস্কৃত, আমি আধুনিক, উদগ্র অথচ নরম, লাজুক। আমি পর্দা ভালোবাসি, ভালোবাসি ঘেরাটোপের আলো, ভালোবাসি আস্তে কথা বলা, এক চিল্‌তে আকাশে অভ্যস্ত আমি। এতবড় আকাশে আমার চোখ বেঁধে যায়।

হঠাৎ চন্দনী বলল, কি করছ একা বসে?

আমি চমকে উঠলাম।

আমি বললাম, ভাবছি।

—কি ভাবছ? চন্দনী বলল।

—এই কম্ফুর কথা, তোমার কথা, চন্দ্রকান্তর কথা।

—ওঃ। ও বলল। তারপর বলল, এত মুখ-গোমড়া করে ভাবাভাবির কি আছে? আমি তো আমার কথা বলেইছি তোমাকে।

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, তা তো বলেইছ।

ভাবলাম চন্দনী একটু বেশী আত্মবিশ্বাসী।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আমার এই বিরক্তিই আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে, কোনো কোনো মুহূর্তে আমি এদের সকলকে পরমাত্মীয় বলে মনে করলেও এই জঙ্গলের ওরা আর আমরা যে আলাদা এ-কথাটা প্রায়ই সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম যে, কালকের দিনটা থেকে তার পরদিনই চন্দনীকে নিয়ে বিড়িগড়ে ছেড়ে দিয়ে আসবো।

আমার বিরক্তি চন্দনী বুঝেছিল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, চলে যাবো আমি? তোমাকে বিরক্ত করলাম?

মনে মনে বললাম, বিরক্ত তো বিলক্ষণই করলে। কিন্তু ভদ্রলোকের মতো মুখে বললাম, না, যাবে কেন? থাকো।

চন্দনী চুপ করে রইল।

আমি বললাম, তুমি নিজে যাও না একবার চন্দ্রকান্তর কাছে। এত কাছে রয়েছ, দেখাও হলো একবার, মিটমাট করে নাও না তোমরা। আমাকে ছুটি করে দাও।

চন্দনী চকিতে মুখ তুলে চাইল। বুঝলাম ও আমার কথায় মর্মাহত হলো। ওর দু'চোখ ভরে জল এলো। বড় বড় আইল্যাশ ভিজে ভারী হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর ও আস্তে আস্তে বলল, তোমাকে তো সব বলেই-ছিলাম তবুও টিকড়পাড়া থেকে আনলে কেন আমাকে? কি দরকার ছিল তোমার?

আমি বললাম, তুমি চিঠি লিখলে; লিখলে, তোমার বড়

বিপদ ! তাই-ই তো দৌড়ে এলাম। এসে কি অন্যায় করেছি ?

চন্দনী বলল, না ! ন্যায় করতেই এসেছিলে হয়তো, কিন্তু যেটা করলে সেটা অন্যায়। তুমি এসে আমাকে অনেক বেশী অপমান করলে। এর চেয়ে যেখানে ছিলাম, সেখানে কম অপমানে ছিলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাহলে যা করছিলে তা বেশ খুশী মনেই করছিলে বলো ? তাহলে আর স্বামীর উপরে রাগ করা কেন ?

চন্দনী জল-ভেজা চোখের চাবুক মেরে আমাকে ধমকে বলল, চুপ করো তুমি ! যা বোঝো না, যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না। তুমি আমাকে বোঝনি একটুও।

আমি বললাম, না-বোঝার কি আছে ? এই তো সীতা কেমন চলে গেল। তোমরা মেয়েরা তা ঐরকমই। নিমকহারাম তোমরা। তোমরা বিশ্বাসঘাতক !

চন্দনী কাঁদতে কাঁদতে হেসে উঠল। বলল, তুমি যে কিছুই বোঝোনি, সীতাকে অথবা আমাকে, এ-সব কথা তারই প্রমাণ।

আমি শুধোলাম, সীতা তাহলে গেল কেন ? শক্ত শরীরের লোভে যায়নি কি ?

চন্দনী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, না !

—তবে গেল কেন ?

—অন্য কারণে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু কারণটা কি ?

চন্দনী ঝাঁঝালো গলায় বলল, কারণটা কম্ফু ভাই সীতাকে কোনোদিনও একটি মেয়ে বলেই মনে করেনি। তার কাছে তার জড়ি-বুটি, তার যশ, তার জগৎ অনেক বড় ছিল। সীতাকে কম্ফু ভাই রান্না করবার, কাঠকুড়োবার, ছেলে-বিয়োনো ও ছেলে-পালার একটি যন্ত্র হিসেবেই দেখেছিল। ও বেচারীও যে একটা মানুষ, ও-ও যে একটু আদর চায়, সঙ্গ চায়, সহানুভূতি চায়, ওদের ঐ ঝুপড়ির মধ্যে সীতারও যে একটা বড় ভূমিকা ছিল সেটা তার স্বামী কখনও

স্বীকার করেনি। এই অপমানেই সীতা চলে গেল। আমিও ঠিক সে কারণেই ফিরে যাবো না চন্দ্রকান্তর কাছে।

এত কথা এই ভাষায় বলেনি চন্দনী। বলেছিল ওর স্বভাবসিদ্ধ, নরম, সংক্ষিপ্ত কাটা-কাটা কথায়। কিন্তু মূল কথাটা এই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি বলছো, তাহলে ঐ জোয়ান ছেলেটার সঙ্গে ওর শক্ত শরীরের জন্য যায় নি সীতা?

চন্দনী আমার দিকে চেয়ে বলল, শোনো, তুমি যে শক্ত শরীরের কথা বার বার বলছ তার চেয়ে ভুল আর কিছু নেই। তোমরা, এই বিশ্ব সংসারের পুরুষরা শুধু একটা জিনিসই বোঝো। ঐ গাল-পোড়া বেঁটে-বাঁটকুল বেনেটার মতো। তোমরা ভাবো যে, আমরা শুয়োরী। আমরা ঐ একটি জিনিস পেলেই বুঝি সুখী থাকি; খুশী হই। তোমরা পুরুষরাই এসব গল্প বানিয়েছো, প্রচার করেছো যে, ঐ একটি জিনিসের জন্যে আমরা তোমাদের খোঁটায় বাঁধা অথবা তোমরা আমাদের। এর চেয়ে বড় ভুল আর নেই।

চন্দনীর কাছ থেকে আমি এসব কথা এমন-ভাবে শুনবো বলে ভাবিনি। ওর কথা শুনে, ওকে উত্তেজিত দেখে, (উত্তেজিত অবস্থায় বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর দেখালো ওকে) আমার বিরক্তি উধাও হয়ে গিয়ে বড় কৌতূহল হলো।

আমি বললাম, বেশ! মানছি যে, আমি ভুল বুঝেছি, এবং আমরা পুরুষরা পাজী, বোকা, সব। কিন্তু তুমি এও তো বলবে যে, কী তাহলে চাও তোমরা পুরুষদের কাছ থেকে? ঠিক কোন জিনিসটা চাও?

চন্দনী বলল, বলব না, বলব না; বলব না।

তারপর একটু থেমে বলল, আস্তে আস্তে স্বগতোক্তির মতো অনেক কথা যা বলল ওর ভাষায় তার সারার্থ হলো, আমরা তোমাদের মতো স্থূল নই। কোনোদিনও আমরা মুখ ফুটে বলব না কি চাই আমরা তোমাদের কাছ থেকে। যদি বুঝতে পারো, তো পারলে। না পারো, তো আমরা একদিন তোমাদের আত্মমগ্নতায়,

উচ্চমন্যতায়, তোমাদের স্বার্থপরতায় থুথু ফেলে তোমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে সীতার মতো হঠাৎ-হঠাৎ চলে যাই। তোমরা ভেবে ভেবে কুল পাওনা কেন গেলাম। তোমাদের অজ্ঞাতে আমরা অন্যর দেওয়া ছেলেকে বুকে করে মানুষ করি। কম্ফু ভাই যখন কুশকে আদর করতো, তখন সীতার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক দেখতাম, একটা চাপা ঘৃণা। আজকে বুঝলাম, কেন?

একটু থেমে দম নিয়ে বলল, শুনে রাখো। আমরা এও পারি। আমরা সব পারি। ভালোবাসতে পারি, ঘেন্না করতে পারি, প্রতি-হিংসাপরায়ণ হতে পারি। আমাদের অবলা বলে কখনও ভেবো না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। চন্দনীর এই বক্তৃতায় রীতিমতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আবহাওয়ার মোড় ঘুরোবার জন্য বললাম, এমন সুন্দর চাঁদনী রাতে এমন সব ঝগড়া-ঝগড়ি কি ভালো? তার চেয়ে বরং কি করে তোমাদের আদর করতে হয়, কেমন করে আদর করলে তোমরা সবচেয়ে খুশী হও, তাই একটু বলো। আমার অবস্থাও যেন কখনও চন্দ্রকান্ত বা কম্ফুর মতো না হয়, তার জন্যে একটু সাবধান হয়ে থাকা তো দরকার।

চন্দনী হেসে ফেলল।

তারপর বলল, বলব না। আমি কেন? কোনো মেয়েই তোমাকে বলবে না কখনও। তার চোখে চেয়ে তার মন বুঝে নিতে হবে তোমার। দু-একজনই তা পারে; সবাই পারে না।

আমি বললাম, তাই-ই যদি হয়, তাহলে লক্ষ-লক্ষ স্বামী-স্ত্রী সুখে ঘর করছে কি করে?

চন্দনী হাসল। বলল, সুখে ঘর করছে তা তোমাকে কে বলল; ঘর করাটা একটা অভ্যাস—সময়ে চান করার মতো, নিমের ডাল ভেঙে দাঁতন করার মতো—অভ্যাসের মধ্যে সুখটা কখন মরে যায় তা কেউ জানতেও পায় না। হয়তো জানতে চায়ও না ভয়ে। তাছাড়া সীতার উপায় ছিল না, আমাদের অনেকেরই উপায় থাকে না।

বললাম, কেন উপায় ছিল না কেন? থাকে না কেন?

চন্দনী রেগে বলল, তোমাদের মতো শরীর দেয়নি যে ভগবান আমাদের—আমাদের রোজগারের সোজা ও সুস্থ উপায় দেয়নি। আমরা যদি একবেলা দু মুঠো ভাতের জন্যে তোমাদের উপর নির্ভর না করতাম, তাহলে কবে কত শত মেয়েরা ছেড়ে চলে যেতো তাদের স্বামীদের। গলায় মালা পরালেই কি স্বামী হওয়া যায়? এক ঝুপড়িতে শুলেই, ছেলেমেয়ের বাবা হলেই কি একজন নারীকে একজন পুরুষ সম্পূর্ণভাবে পায়? আমরাও তো মানুষ। আমাদের মনের উপর যাদের দখল নেই, তারা শরীরের দখল নিয়ে একটু খেতে দিয়ে, একটু পরতে দিয়েই বড়াই করে। তোমরা ঐটুকুই বোঝো—বাকিটা কখনও বোঝো নি, বুঝবেও না।

বলেই দুম্ দুম্ করে পা ফেলে চন্দনী ঝুপড়ীতে ঢুকে গেল।

অনেকখানি হাঁটাহাঁটি কবায় সেদিন বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কিন্তু কিছু খাইনি বলে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসেনি। ঘুম যখন এলো, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও এলো। স্বপ্নই আগে এলো, না ঘুম বলতে পারি না। অবচেতন থেকে চেতনহীনতায় গড়িয়েই তারা আসে। তাই দুজনে একসঙ্গেও এসে থাকতে পারে।

আমি দেখলাম, সেই বধ্যভূমি বারিরির মালভূমিতে আমি আর চন্দ্রকান্ত বসে আছি। চন্দ্রকান্তর পরনে একটা মোটা ধুতি। গায়ে একটা নীলরঙা কাঁধ ছেঁড়া শার্ট।

চন্দ্রকান্ত একটা পাথরের উপরে বসে সামনের উন্মুক্ত বন-জ্যোৎস্নায় ভিজে স্নুপস্তুপ করা প্রান্তরে চেয়ে আছেন। চতুর্দিকের সেগুন বনে চাঁদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। সেগুনের পাতার ভিতর দিকটা সাদাটে সাদাটে। ভিতরের দিকে যেখানে যেখানে আলো পড়ছে সেখানে কেউ যেন রূপো গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে মনে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ওসব কথা শুনবেন না, ওসব মেয়েদের কথা। ওরা, ওরা ; আমরা, আমরা। মানুষের ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে পুরুষকে হাতছানি দিয়েছে দিগন্ত। পুরুষই ডাইনোসরের সঙ্গে

পাথরের হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছে। এক জায়গা ছেড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় ঘর বেঁধেছে। এক নারী ছেড়ে অন্য নারীতে। পুরুষের রক্তে স্থিতি নেই ; ঘর নেই। নারীই ঘর বেঁধে পুরুষকে ঘরের চার দেওয়ালে বন্দী করে রেখেছে তার মোহন ললিতলীলায়, তার চোখের বিলোল চাউনিতে, তার মিষ্টি গলার স্বরে, তার গ্রীবা হেলনের মনোরম ভঙ্গীতে, তার বেশবাসে, তার কেশ পরিপাট্যে, তার নরম সুরেলা শারীরিক বিশেষত্বে পুরুষকে চিরদিন কাছে রেখেছে।

পাছে পুরুষ তাকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যায়, তাই তার মধ্যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য সমস্ত সুরের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন বিধাতা। মানুষ বাঁধা পড়েছে। নারীর মধ্যে দিয়ে নিজেকে নিরন্তর পুনরুজ্জীবিত করেছে, পুরুষের রক্ত ছিনিয়ে নিয়ে নারী তার নিজের জরায়ুতে তাকে শুদ্ধ করে, তাতে মন্ত্র পড়ে, তার রক্তের শরিক সৃষ্টি করেছে। সে যখন জরাগ্রস্থ যৌবনহীনা হয়েছে, নারী নিজে যখন তার নিজের কারণে নিজের লোভনরূপে আর পুরুষকে বাঁধতে পারেনি—যখন প্রেমে পারেনি—তখন অপত্য স্নেহের অমোঘ রজ্জু জড়িয়ে দিয়েছে পুরুষের পায়ে, যেমন করে পুরুষ বুনো ঘোড়া ধরেছে, তেমন করে ল্যাসো দিয়ে পুরুষকে ধরেছে নারী।

একটু চুপ করে থেকে চন্দ্রকান্ত আবার বললেন, এ এক গভীর ষড়যন্ত্র।

আমি স্বপ্নের মধ্যে হাসলাম, সে হাসি আমিই শুধু শুনতে পেলাম, আর কেউ নয়। বললাম, নারী কি পুরুষের পরিপূরক নয় ? কী এমন ক্ষতি করল নারী আপনার ? মানে, পুরুষদের ?

—করেছে, করেছে, বিলক্ষণ ক্ষতি করেছে। নারী বাঁধন, পুরুষ মুক্তি। একজনের জীবনের মূলমন্ত্র পরাধীন হয়ে থাকার ছলে পুরুষকে পরাধীন করা আর পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র সব পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়ে স্বাধীন হওয়া।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বড্ড বেশী অ্যাকাডেমিক। বুঝতে পর্যন্ত পারছি না আমি।

স্বপ্নের চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, পারবেন না।

আমি বললাম, আপনি এমন বাঁধনছেঁড়া, ঘরবিদ্বেষী, বুনো হয়ে উঠলেন কি করে? বিড়িগড়েও তো ঠিক এমনটি দেখিনি আপনাকে। তখনও সাধারণ গৃহী-জীবনের প্রতি, চন্দনীর প্রতি, আপনার একটা আকর্ষণ ছিল, যতই তা ক্ষীণ হোক না কেন?

সে কথা এখন থাক্। তারপর বললেন, পুরোনো দিনে তো ঘোড়াই ছিল শক্তির মান। সেযুগে নিউক্লিয়ার পাওয়ার ছিল না, অন্য অনেক কিছুই ছিল না। তাই সমস্ত শক্তির মূল্যায়ন করতো মানুষ তখন অশ্বশক্তি দিয়েই। রবীন্দ্রনাথের একটা দারুণ গল্প পড়েছিলাম, ঘোড়ার সৃষ্টির উপরে। পড়েছেন?

—না তো! আমি বললাম।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। বললেন, অথচ আপনি বাঙালী। রবীন্দ্রনাথের গর্বে আপনারা ফুলে ফেঁপে থাকেন, অন্যদের হেয় করেন, অথচ তাঁর লেখা পড়ার অবকাশ পর্যন্ত হয় না আপনাদের।

আমি লজ্জিত হলাম।

চন্দ্রকান্ত কথা ঘুরিয়ে বললেন, সৃষ্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে যখন, তখন সৃষ্টিকর্তা দেখলেন, প্রচুর মালমশলা বেঁচে গেছে। ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম্, অপ্ ইত্যাদি বহু উপাদানের মধ্যে ব্যোম্ রয়ে গেছে বেশী। তাই দিয়েই তলানী-টলানী ঢেলে-ঢুলে সৃষ্টি করলেন ঘোড়াকে তার মধ্যে ব্যোম্ই সবচেয়ে প্রবল ছিল বলে কারণে-অকারণে সে মাথা উঁচু করে ঘাড় বেঁকিয়ে প্রান্তরের পর প্রান্তর দৌড়ে যায়। তার কেশর ওড়ে হাওয়ায়, তার বুকে মুখে হাওয়া লাগে, তার নাকে শোঁ শোঁ করে উদার বাতাস ঢোকে, সূর্যকিরণে তার চিকণ চামড়া ঝক্মক্ করে ওঠে, তার পেশীতে ঢেউ জাগে ছলাৎ ছলাৎ করে—সে তবু দৌড়োয়। কোনো গন্তব্যের জন্যে নয়, বাঁধা থাকতে যে সে ভালোবাসে না সেই জানাটা পৃথিবীময় জানান দেওয়ার জন্যে সে দৌড়ে বেড়ায়।

আমি বললাম, খামোখা দৌড়ে লাভ কি? গন্তব্যহীনতা তো

মৃত্যুরই সমকামী।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আপনি বুঝবেন না। যারা দৌড়োয়, যারা বাঁধন ভাঙে, স্বাধীনতার স্বাদে যাদের নাক ভরেছে, তারাই শুধু এ দৌড়ের মজা জানে। পরাধীন গৃহপালিত দয়ানির্ভর জন্তু যেমন জাব্‌নায় মুখ ডুবিয়ে দ্রুত-ধাবমান স্বাধীন ঘোড়ার খুরের শব্দে তাদের নির্বোধ ভাবালু চোখ তুলে বোকার মতো তাকায়, তেমন অনেক মানুষও তাকায় ঐ স্বল্প সংখ্যক দৌড়ে-বিশ্বাসী মানুষগুলোর দিকে। ওরা ওদের বড় ভালবাসে। ওদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ওদের ঘৃণাভরা স্বাচ্ছল্য, ওদের গলার দড়িকে ওরা বড় ভালবাসে। ওরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটু খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। ইজ্জৎ বা স্বাধীনতার বোধ ওদের কখনও ভাবায় না। ওরা মন্থর, লজ্জার, গ্লানির, ওদের বড় সুখের জীবনে, চোখ রাঙানির ভয়ে, লাঠির ভয়ে চুপ করে থাকে। ঐ পুরুষগুলো গৃহপালিত বা রাষ্ট্রপালিত বলদ। এবং আমি আর আমার মতো কতিপয় নষ্ট লোক বুনো ঘোড়া।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ওরা যা কিছু পেয়েছে জীবনে, নিজেদের গায়ে আঁচড়মাত্র না লাগিয়ে, নিজেদের স্বার্থপর ভীরুতার দুর্গন্ধি বালাপোষে মুড়ে রেখে, তা এই মুষ্টিমেয় লোক-দেরই জন্যে। আমার মতো লোকেদের আপনারা মূর্খ বলেছেন, বলেছেন বিকৃতমস্তিষ্ক, বলেছেন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, কিন্তু আমাদের জন্যেই, আমাদের কষ্টের ও পাগলামির মূল্যেই আপনাদের মত ক্ষুদ্র গৃহী, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, সুখ-সন্ধানী লোকেরা দিনে দিনে পুষ্ট হয়েছেন। আমরা যখন হিমেল বাতাসে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আপনা-দের সুখ ও শান্তির সীমানা পাহারা দিয়েছি সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম থেকে—আপনারা স্ত্রীর বা প্রেমিকার বুকে ঘন হয়ে, রুদ্ধ ঘরের আরামে রাত কাটিয়েছেন। আপনারা আমাদের কথা বুঝবেন না। বোঝার চেষ্টাও করবেন না কখনও। কারণ বোঝার চেষ্টাটুকুতেও আপনাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। আপনারা যে পোষা পাখি। ঝড়ের বাতাসকে আপনাদের যে বড় ভয়। কিন্তু আমরা যে ঝড়েই বার বার

ডানা ভেঙ্গে পড়েছি, আমরা গুলিবিদ্ধ হয়েছি, ধরে ধরে আমাদের ডানা কেটে দেওয়া হয়েছে কতবার, বিচার বা ন্যায়ের প্রহসনে প্রহসনে আমরা হাসতে হাসতে এমন পর্যায়ে এসেছি যে, তাকিয়ে দেখুন আমাদের চোয়াল ফাঁক হয়ে আছে। চোয়াল-ফাঁক জীবন্ত আমাদের ; আমাদের শবের। প্রচণ্ড প্রাণসত্তায় আমরা তবু দৌড়ে গেছি, অন্যায়ের, অবিচারের, গ্লানির, পরাধীনতার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছি। আমরা যুগে যুগে মরেছি ; কিন্তু আমাদের রক্তবীজ এই ধরিত্রীর বুকে ছড়িয়ে গেছে। লক্ষর মধ্যে এক। একজন মাথা তুলেছে লক্ষর মধ্যে। তার শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। আবার অন্য কেউ তার স্থান পূরণ করেছে। আমরা কচুরীপানার জাত। আমাদের শেষ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। আমরা আত্মার মতো অবিনশ্বর, আগুন আমাদের পোড়াতে পারে না, জেলখানা আমাদের আটকাতে পারেনা, বন্দুকের গুলি আমাদের রক্তাক্ত করে, মৃত করে, কিন্তু কখনও বিদ্ধ করে না। আমরা ধ্বংস হই, কিন্তু হারি না কখনও। কারণ আমরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। আমরাই সবচেয়ে আগে আগে যাই যে কোনো শোভাযাত্রায়। আমরা লড়াই করি, যুদ্ধ জিতি, প্রতিবাদ করি, স্বাধীন গ্রীবা তুলে, শির উঁচিয়ে দাঁড়াই। আপনারা ভয়ে মুখ ঢাকেন, দুয়ার বন্ধ করেন তারপর আমরা যা চেয়েছিলাম তা অর্জন করলে আপনারাই এগিয়ে এসে তার সিংহ ভাগ নেন। ভালো জামাকাপড় [illegible]রে আপনারা আপনাদের কাপুরুষের হৃদয় ঢেকে গাছেরটাও খান, তলারটাও কুড়োন। আপনারা চিরদিনই তাই করে এসেছেন। ঘেন্না, ঘেন্না, আপনাদের ঘেন্না, বড় ঘেন্না আমার।

এতকথা একসঙ্গে শুনে আমি বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বললাম, কিন্তু কি আপনি করতে চান ? গাছের টঙে বসে নিজের স্ত্রীকে অপমানের মধ্যে অসম্মানের মধ্যে নিক্ষেপ করে কিসের সাধনা করছেন আপনি ?

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বললেন,

কিছুই করছি না। ভাবছি! কি করব, কি করা উচিত তাই ভাবছি।

—কাদের জন্যে কি করা উচিত?

—সকলের জন্যে। এই নারাণ, কম্ফু, কালিন্দী, যুধিষ্ঠির, এই রত্নাকর, চন্দনী, এমনকি আপনারও জন্যে। আপনার এবং ওদের সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, ঘোলা। আপনাদের দৃষ্টি শুধু দিগন্ত অবধিই বিস্তৃত। আমার দৃষ্টি দিগন্তকে ছাড়িয়ে যায়। আমার সোনার ভারতবর্ষকে সোনার মানুষে ভরে দিতে চাই আমি। মানুষের মতো মানুষে। যারা শ্রমবিমুখ নয়, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, যারা সাহসী, যারা স্বাধীন, যারা সৎ, যারা পৃথিবীর সব জাতের সেরা জাত সেই ভারতীয়দের জন্যে। আমার কোনো দল নেই, ইজম্ নেই, গদী নেই, তার জন্যে কাঙালপনাও নেই, আমি শুধু চাই যে, আমাদের নেতারা সত্য হোক, সুন্দর হোক, তারা যেন শুধু ভঙ্গী দিয়ে না ভোলায় চোখ। সব নেতারা। সব দলের নেতারা।

আসলে এরা কেউ কম্ফু নারাণ চন্দনীদের নেতা নয়। এরা আপনাদের নেতা। আপনারা এবং আপনাদের নেতারা আমাদের কেউ নন। আমাদের কথা আপনারা কেউই ভাবেন না। ভাবেননি কোনোদিনও। আপনারা বড় ইতর, নীচ, বড় ভণ্ড।

আমি বললাম, এই বাঘ-ভাল্লুকের জঙ্গলে বসে এসব কথা ভাবলেই কি আপনি কিছু করতে পারবেন? আপনার দল কই? প্রচারক কই? কে আপনার কথা শুনবে? কে চেনে আপনাকে?

কেউ শুনবে না, কেউই চেনেনা আমাকে। কিন্তু আমার ভাবনা অন্যদের ভাবতে শেখাবে। কম্ফুকে, নারাণকে, চন্দনীকে এমনকি আপনাকেও। আমার ভাবনার রেশ অন্যের মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যাবে। আপনাদের মধ্যে যদি সকলেই ভাবেন, নিজের নিজের স্বার্থ একটু-মাত্র ক্ষুণ্ণ করে নারাণ কম্ফুদের কথা একবারও ভাবেন, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আপনাদের ঘুম-পাড়ানো বিবেক ঘুম ভেঙে উঠবে, চোখ মেলে চাইবে, এইই আমার একমাত্র কামনা,

বাসনা, যাই-ই বলেন সব।

আমি বললাম, আপাততঃ আপনি কি করতে চান?

—আরেকটা হাতী মারতে চাই। চন্দ্রকান্ত হেসে বললেন।

আমি বললাম, এ জঙ্গলে তো হাতী নেই।

—না, হাতী নেই। কিন্তু ভয় আছে। ঐ গুণ্ডা হাতীটারই সে সমগোত্রীয়। ছবি নায়েক। লোকটা আমার এই আপনজনদের বুকের মধ্যে ভয় সেঁধিয়ে দিয়েছে। বুঝলেন মশায়। যে বুকের মধ্যে ভয় নিয়ে বাঁচে সে মরে গেছে। নিশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়ার মানেই বেঁচে থাকা নয়! আমি ওদের বাঁচতে শেখাবো। চীনা দার্শনিক কনফ্যুসিয়াস বলেছিলেন :

"It you pay evil with good, what do you pay good with?"

আমি সে কথায় বিশ্বাসী। ঐ গাল-পোড়া বেনেটাকে ওদের চোখের সামনে মেরে আমি ওদের জানিয়ে দেবো যে, পৃথিবীতে ভয় পাওয়ানোর মতো কিছুই নেই মানুষকে। কোনো রক্ত-চোখ, কোনো বন্দুকের নল, কোনো শারীরিক বা অর্থনৈতিক অত্যাচারই শেষ কথা নয়। ওদের নিজেদের জন্যে, ওদের উত্তরসূরীদের জন্যে, মাথা তুলে ওদের দাঁড়াতেই হবে। তা নইলে, ওদের চিরদিনই আজকের মতো আফিং-গোলা জল খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমি বললাম, কিন্তু আপনার যে জেল হবে, ফাঁসি হবে।

—হোক না। চন্দ্রকান্ত বললেন।

তারপর বললেন, আমার জীবনে আছেটা কি? আমি ফাঁসিতে ঝুলে কি জেলে গিয়েও যদি ওদের এই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারি, যদি ওদের সামনের দিকে কিছুটাও এগিয়ে দিতে পারি, তাহলেও তো জানব, জীবনে কিছু একটা করে গেলাম। শুধুই টাই পরে অফিস গেলাম না আপনাদের মতো, শুধুই নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, নিজের চাকরির উন্নতি, নিজের আরাম নিয়ে নরকের কীটের মতো সব মান-সম্মান স্বাধীনতার বোধ বিসর্জন দিয়ে তবুও

শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকলাম না। আপনারা যে বাঁচা বাঁচছেন তাকে কি বেঁচে থাকা বলে? এই আপনারা, চাকরি বা ব্যবসা করছেন, টাকা কামাচ্ছেন, বিয়ে করছেন, ছেলে মেয়ের বাবা হচ্ছেন, বুড়ো হচ্ছেন, বাতে কোঁকাচ্ছেন, তারপর একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চুপে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছেন। এই দেশটাকে শুধু আপনার উত্তরসূরীই নয়, সকলের উত্তরসূরীর জন্যেই কি আরো একটু ভালো দেখে যাওয়া, কিছুমাত্র অবদান রেখে যাওয়া আপনার কর্তব্য নয়? কেন এত লেখাপড়া শিখলেন? দৈনিক কাগজে লেটারস টু দ্যা এডিটরস্ কলামে বাংলার বা ইংরিজীর তুবড়ী ছুটোবার জন্যেই শুধু? আপনাদের শিক্ষার কি আর কোনোও উদ্দেশ্যই ছিল না? শিক্ষা মানে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ মারা কাগজ শুধু?

তারপর একটু থেমে বললেন, শুনেছি, ঐ গাল-পোড়া বেনেরও তেমন একটা কাগজ আছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। কি বলব, ভেবে পেলাম না।

স্বপ্ন অথবা ভাবনা ভেঙে গেল শেষ রাতে অনেকগুলো কুকুরের চিৎকারে। কুকুরগুলো ক্যাম্পের চারপাশে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল। কয়েকজন লোক কথাবার্তা বলছিল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এলাম।

ক্যাম্পের সামনের বড় আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। চাঁদনী রাতেও একটা আগুন থাকেই জঙ্গলে—পাছে জন্তু-জানোয়ারেরা চলে আসে ভুল করে। দেখি, ক্যাম্পের সকলেই প্রায় উঠে পড়েছে, উঠে বারিরির দিকে যে পাকদণ্ডী পথটা চলে গেছে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলছে।

বুনো কুকুরের দল ক্যাম্পের চারদিকে নেমে আসছে বারিরি বেয়ে। ভয়-পাওয়ানো গলায় অদ্ভুত কুঁই কুঁই আওয়াজ করছে। এমন সময় একটা একলা মাদী চিতল হরিণ অর্জুন ঝোপের আড়াল থেকে সোজা নেমে এলো হড়্বড়্ খর্খর্ আওয়াজ করে পাথরে-

পাথরে একেবারে ক্যাম্পের সামনে। ক্যাপ্‌-কাটা কুলীরা হৈ-হৈ করে ওঠায় হরিণীটা একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কি যেন ভাবল হরিণীটা। তারপর কুকুরগুলোর চেয়ে মানুষগুলো কম বেপরোয়া ভেবে মানুষগুলোর দিকেই এগিয়ে এলো।

ঝুনো কুকুরগুলো চতুর্দিকে লাফালাফি করতে লাগল। মুখের খাবার পালিয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত হিংস্র স্বরে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। তাদের সম্মিলিত ডাক পাহাড়ে-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সারা বনে ছড়িয়ে যেতে লাগল প্রতিধ্বনি তুলে।

রত্নাকর হঠাৎ বলল, মার্ এটাকে। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে না। মাংস ভাল—কচি আছে।

নারাণ হঠাৎ চটে উঠে বলল, রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে নেই। দীনবন্ধু পাপ দেবেন তাহলে।

রত্নাকর হাসল। ওর হাসি কুকুরগুলোর চিৎকারের সঙ্গে মিশে গেল। বলল, ছাড় তোর দীনবন্ধু।

মনে হলো, দীনবন্ধুর ভরসাতে রত্নাকরের আর দরকার নেই। ওর জমি-জমা আছে, টাকা আছে, সাইকেল আছে, পাকা ভবিষ্যৎ আছে; ও কেন এই হতভাগাগুলোর মতো দীনবন্ধুর ভরসায় থাকবে। ও বলল; আন; আন; টাঙ্গী আন।

কুলীরা সকলেই লোভাতুর মাংসলোলুপ চোখে হরিণীটির দিকে তাকালো, তারপর কি হলো, কে জানে, সকলে মিলে রত্নাকরকে বলল, না এটা অন্যায় কাজ হবে। ওকে মারা ঠিক হবে না।

হরিণীটা এতক্ষণ তার বড় বড় ভয়াতুর চোখ মেলে মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোজা বারিরি বেয়ে পাকদণ্ডীতে নেমে এসেছে বোধহয় ও। তখনও ওর সামনের পা দুটো, বুকের সামনেটা থরথর করে কাঁপছিল। বুনো কুকুরগুলো বধ্যভূমিতে ধাওয়া করে ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল।

হরিণীটা এবারে বসে পড়ল। কুকুরগুলো অনেকক্ষণ চারিদিকে বসে ডাকল, লাফালাফি করল তারপর হরিণী আমাদের আশ্রয়

পেয়েছে দেখে চলে গেল। কুকুর তো কুকুরই। মানুষ না হলেও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন জীবকে ওরা মানুষ বলেই মনে করে, ভুল করে ভয়ও পায়। কুকুররা সব সময়ই ভয় পায়।

আমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

॥ ৮ ॥

কাল শেষ রাতে উঠে পড়ায় একটু দেরীতে ঘুম ভেঙেছিল। উঠে শুনলাম, দিনের আলো ফোটার অনেকক্ষণ পর অবধি হরিণীটা ছিল ক্যাম্পের মধ্যে। তারপর বুনো কুকুরের দল যেদিকে চলে গেছিল তার বিপরীত দিকে নালা টপকে জঙ্গলের গভীরে পালিয়েছিল।

আজ দোল পূর্ণিমা। বসন্তের বাতাস ফিস্‌ফিস্ করছিল প্রথম ভোরে। এখন বনমর্মর উঠেছে হাওয়ায়। শুকনো পাতা গড়াচ্ছে পাথরে পাথরে। পাতায় পাতায়—ডালে ডালে কানাকানি শুরু হয়েছে। বাঁশের ফিকে-হলুদ, শুকনো, লম্বাটে পাতাগুলো কোন দূর থেকে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দুলতে দুলতে এসে একটা ধাতব শব্দ করে পাথরের উপর পড়ছে।

আজ শরীরটা ভালো নেই। ঋতু বদলের ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বর জ্বর লাগছে। তাই ক্যাম্পের বাইরে একটু দূরে একটা বড় আম-গাছ তলায় সতরঞ্জি পেতে বসে বহুবার-পড়া আমার প্রিয় বই পড়-ছিলাম নতুন করে। সরলা দেবীর "জল বনের কাব্য"। একটি কিশোরী, নববিবাহিতা; ভীতু মেয়ের চোখে সুন্দরবনকে দেখার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা আছে এতে। শিবশঙ্কর মিত্র মহাশয়ের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' ছাড়া সুন্দরবনের উপরে এত ভালো ও সত্য বই বেশী পড়ি নি।

চন্দনী মাঝে মধ্যে এসেছে গেছে। টুক্‌টাক কথা হয়েছে। এখন ও নালাতে গেছে চান করতে। কি সব দিয়ে ফুল ফলের রস দিয়ে যেন মাথা ঘষে চান করে ও।

আমাদের এখানে তেমন হোলিখেলা হয় নি। রত্নাকরের কাছে একটু গোলাপী আবীর ছিল। তাই-ই একটু চেয়ে নিয়ে চন্দনী আমার পায়ে দিয়ে প্রণাম করেছিল। আমি ওর কপালে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা খেলিনি সত্যি। কিন্তু সমস্ত প্রকৃতি পলাশে, শিমুলে, মহুয়ায়, অর্জুনে, বনের বুকের কোরকের সুগন্ধে বড় মনোরম হোলিখেলা খেলছে ক'দিন হলো। যে এ খেলা দেখেছে, যে দেখার চোখ নিয়ে জন্মেছে; তার অন্য কোনো খেলাতেই বুঝি আর প্রয়োজন নেই।

চুল ঝাঁপিয়ে ফুলিয়ে চন্দনী চান করে আসছিল নালা বেয়ে। ওকে দূর থেকে নালার পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বালির গেরুয়াতে পা ফেলে-ফেলে হেঁটে আসতে দেখছিলাম। টুঁই পাখি ডাকছে টুঁই-টুঁই, চিঁটুই করে চল্‌কে চল্‌কে। বাতাসে বসন্তের গন্ধ, আরাম আবেশ, আকাশে নরম রোদ, আমার সামনে নরম লতানো লাজুক চন্দনী হেঁটে আসছে।

আমাকে দেখেনি ও। চান করে উঠে শাড়ি আলগা করে পেচিয়ে নিয়েছে শুধু; ঝুপড়িতে এসে জামা-টামা পরবে। অনবধানে তার বাঁ-দিকের বুক থেকে শাড়ি সরে গেছে—কি নিটোল, মসৃণ, সান্ত্বনার স্তন! এই চিরন্তন নারী চন্দনী এবং এই পরিবেশ—সব মিলেমিশে আমাকে এক নিবিড় আশ্লেষে ভরে তুলল। বড় খুশী হলাম আমি। বড় কৃতজ্ঞ হলাম। বারবার হই। বড় শান্তি, বড় নির্মল, নিঝুম, স্নিগ্ধ শান্তি চারিদিকে।

এমন সময় আমাকে চমকে দিয়ে একটা লোক দৌড়ে এলো চন্দনীর পিছন দিক থেকে নালা বেয়ে। চন্দনী ঘুরে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই লোকটা চন্দনীকে জাপ্‌টে ধরল।

কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে আমি লোকটার কাছে যাওয়ার জন্যে যেই উঠেছি, অমনি একটা লোক আমার পেছন থেকে বলে উঠল, একটুও নড়াচড়া নয়; নড়লেই গুলি করবো।

পিছন ফিরে দেখি ছবি নায়েকের সেই সাগরেদ। বন্দুকের নলটা

প্রায় আমার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, বসে পড়, যেমন বসেছিলে।

আমি যতক্ষণ বই পড়ছিলাম, বই থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে প্রকৃতির রূপে, গন্ধে, শব্দে, বিভোর হয়ে ছিলাম, ততক্ষণে এই লোকটা নিশ্চয়ই চুপি চুপি আমার পিছনে এসে পৌঁছেছিল। শুধু এইই নয়। আরো একজন লোক দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে চন্দনীকে ধরল। চন্দনী যখন চেঁচাচ্ছিল, হাত-পা ছুঁড়ছিল, গালাগালি করছিল—বলছিল, ভগবান তোমাদের শাস্তি দেবে—ততক্ষণে অন্য একটা লোক দড়ি দিয়ে আমগাছের ডালের সঙ্গে আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছিল।

বন্দুকধারী লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, মেয়েটা বড় চেঁচাচ্ছে, ওর মুখে এক মুঠো বালি পুরে দে।

একটা লোক নালা থেকে এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে জোর করে চন্দনীর মুখ হাঁ করিয়ে বালি পুরে দিলো।

আমাকে বাঁধা শেষ হলে, আমার মুখেও ওরা জোর করে একমুঠো বালি ভরে দিলো।

বন্দুকধারী লোকটা বলল, তোমার সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। তবে আমাদের পিছু নিও না। চন্দ্রকান্তকে মানা কোরো পিছু নিতে। পিছু নিলে তোমাদের লাশ ফিরবে এখানে, নিজের পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে না আর। মনে থাকে যেন।

তারপর ওরা চন্দনীকে নিয়ে পথে গিয়ে উঠল। আমি যেখানে বাঁধা ছিলাম, সেখান থেকে ঝুপড়ি বা ক্যাম্প দেখা যাচ্ছিলো না। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ছিল। ভাবছিলাম রত্নাকর কোথায় গেল, নারাণটাই বা কি করছে?

ওরা পথে উঠে আড়ালে চলে যাওয়ার পরই একটা জীপের এঞ্জিন স্টার্ট করার আওয়াজ পেলাম।

অবাক হলাম জীপটা আসার আওয়াজ শুনিনি বলে। বোধহয় উৎরাইতে এঞ্জিন বন্ধ করে গড়িয়ে নামিয়েছিল ওরা জীপটাকে। তাছাড়া আজ জঙ্গলে বাতাস জোর থাকায় ঝরণার মতো একটা

শব্দ উঠেছিল সকাল থেকেই। সে কারণেই হয়তো শুনতে পাইনি।

কতক্ষণ সময় যে কেটে গেল জানি না। মুখের মধ্যে দুশো গ্রাম বালি নিয়ে আমার সমস্ত ভিতরটা শুকিয়ে উঠছিল। বারবার চন্দনীর কথা মনে হচ্ছিল। ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর হাত-পা ছোঁড়া দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন গভীর জলে অথবা চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে রোদ প্রখর হলো, তারপর অনেকক্ষণ পর রোদ পড়তে থাকল, গাছ গাছালির ছায়া দীর্ঘতর হয়ে এলো।

বড় পিপাসা পেয়েছে।

বোধহয় ঘোরের মধ্যে ছিলাম এমন সময় মানুষের গলা শুনলাম। কুলীরা ক্যাম্প্ থেকে ফিরছে।

তাড়াতাড়িই এসেছে ওরা। ক্যাম্পে নারাণের দয়ায় একটু চা-টা খেয়ে সকলে মিলে সর্পগন্ধা গ্রামে নীলমণি চক্রবর্তিরায়ের রাজনন্দিনী যাত্রা দেখতে যাবে।

একটু পরই ক্যাম্পের কাছে একটা সোরগোল শুনলাম। উত্তেজিত হয়ে ওরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। তার বেশ কিছুক্ষণ পর ওদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে দেখলাম। দুজন লোক আমার দিকে দৌড়ে এলো। ওরা দৌড়তে দৌড়তে বলল, বাবু এদিকে রে, এদিকে।

ওরা সকলে মিলে হাত লাগিয়ে আমার বাঁধন খুলল, তারপর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বালি বের করে দিলো। পেতলের ঘটিতে করে ক্যাম্প থেকে জল আনল মুখ-ধোওয়ার আর খাওয়ার জন্যে।

ক্যাম্পের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি নারাণ গাছে ঠেস্ দিয়ে বসে আছে। ওর হাড় পাঁজর বের করা তামাটে শরীরের উপর দড়ির দাগ কেটে বসে গেছে। কম্ফুর রুগী বলদটা দাঁড়িয়ে আছে পাশে গাছতলায়; একটু একটু করে হাঁটছে ও। ঐ বলদটার দড়ি খুলেই নারাণকে বেঁধেছিল ওরা।

কথা বলার মতো অবস্থায় ফিরলে আমি বললাম, রত্নাকরকে

পেলে ? ওরা বলল, রত্নাকর তো আজ ভোরে উঠেই সাইকেল নিয়ে চলে গেছে সদরে। আপনি জানতেন না বুঝি ?

আমরা জল খেয়ে যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠলাম, তখন কালিন্দী বলল, ছবি নায়েকের সঙ্গে কেউ পারবে না। ওর সঙ্গে লড়তে যেওনা বাবু। ও সাপের মতো। বাঘকে দেখা যায়, বোঝা যায়, কিন্তু সাপের দেখা! এই জঙ্গলে থেকে ওর সঙ্গে টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি শুধোলাম, চন্দনী ?

কালিন্দী বলল, চন্দনীর কাজ ফুরোলেই চন্দনীকে ছেড়ে দেবে। চন্দ্রকান্তবাবুকে জব্দ করার জন্যেই চন্দনীকে ওরা এমন অপমান করে ক্যাম্প থেকে নিয়ে গেল। না হলে এই জঙ্গলের মধ্যে ওরা তো সহজেই ওকে নিয়ে যেতে পারত। ওরা আসলে তোমাদের সাবধান করে দিলো ভয় দেখিয়ে।

আমি বললাম, কম্ফু কোথায় ? কম্ফু অন্ততঃ আমার সঙ্গে যাবে। কেউ না গেলে, আমি একাই যাবো।

নারাণ বলল, চলুন বাবু, আমি যাই। এত অপমান! নারাণ রাগে ফুলছিল।

যুধিষ্ঠির বলল, বোকামি করিস না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়া মরে। বাবু বা চন্দ্রকান্ত কি চিরদিন তোকে বাঁচাবেন ? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ভালো না। বাবুর বাঁধন খুলে দিয়েছি, যা পারে করুন বাবু।

দেখলাম যুধিষ্ঠিরের কথায় সকলেই সায় দিলো। একজন দুজন ছাড়া।

আমি বললাম, যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছে। এ ব্যাপারে তোরা জড়িয়ে পড়িস না। যা করার আমিই করছি।

ওরা মুখে মুখে ছবি নায়েকের তিন পুরুষ উদ্ধার করে দিলো। যদি মুখের কথায় বংশবৃদ্ধি হতো তাহলে ঐ আধঘণ্টার মধ্যে ছবি নায়েকের পরিবারে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের জন্ম হয়ে যেতো— মায় ওর ভাই বোন পর্যন্ত।

কিন্তু চন্দনীকে নিয়ে যাওয়ার ও আমাদের বেঁধে রাখার ঘটনাটা ওদের যাত্রা দেখতে যাওয়ার আনন্দকে কিছুমাত্র ম্লান করল না। বিচলিতও হলো না মনে হলো। যাত্রা, ওরা ন'মাসে-ছ'মাসে দেখার সুযোগ পায়।

নারাণ চা বানালে ওরা চা খেয়ে যাত্রা দেখতে যাবে বলল।

নারাণ বলল, আমি যাবো না। আমার গায়ে ব্যথা।

জীপের কাছে গিয়ে দেখি সব ক'টা টায়ারের হাওয়া খুলে দিয়ে গেছে ছবির লোকেরা, এমন কি স্টেপ্‌নীরও।

ওরা চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে আমি পিস্তলটা কোমরে বেঁধে চন্দ্রকান্তর কাছে গেলাম। আমার তক্ষুণি দৌড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল সেই গাল-পোড়া বেনেটার কাছে, কিন্তু ওর আস্তানাতে কখনও যাইনি আমি। চিনতে পারব না হয়ত।

চন্দ্রকান্তর ডেরার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছি যখন তখন দেখি চন্দ্রকান্ত নালার দিকেই আসছেন। পাছে ভুল ভাবেন, তাই আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। উনি চমকে উঠেই রাইফেলের কুঁদোয় হাত ছোঁওয়ালেন। তারপরই হাত নামিয়ে নিলেন। কাছে যেতেই দেখি, ওর পিছনে কক্ষ্ণু! কক্ষ্ণুর হাতে চন্দ্রকান্তর দোনলা বন্দুক।

আমার কাছে সব শুনলেন চন্দ্রকান্ত চলতে চলতে। শুনতে শুনতে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, উনি বললেন, আজকে এমনিই বোঝা-পড়া করতাম আমি ছবির সঙ্গে। এমনই কিছু একটা করবে ও তা জানতাম। তবে ওর এত অসুবিধা হবে ভাবিনি।

আমি বললাম, আমিও যাবো।

উনি দৃঢ় গলায় বললেন, না!

—না কেন? আমি বললাম।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আপনি চন্দনীর জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। চন্দনী এখনও আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এই অপমানের শোধ আমাকেই নিতে দিন। আপনি কেন এই মারামারির খুনোখুনীর মধ্যে জড়াবেন নিজেকে? সামনের মস্ত

সম্ভাবনাময় জীবন পড়ে আছে আপনার।

"সম্ভাবনাময়" কথাটা আমার কানে দ্ব্যর্থক শোনালো।

চন্দ্রকান্ত বললেন, এই লড়াইটা আমাকেই লড়তে দিন।

ক্যাম্পের কাছে আসতেই নারাণ চন্দ্রকান্তকে বলল, বাবু আমিও যাবো। নারাণ ওর তাল-ঢ্যাঙ্গা রোগা-পটকা চেহারায় একটা লম্বা হাতওয়ালা টাঙ্গী নিয়েছে কাঁধে।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। নারাণকে হাত তুলে নিষেধ করলেন। তারপর কম্ফুর দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কি যেন ইশারা করলেন দুজনে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, ক'টা বাজল আপনার ঘড়িতে?

আমি বললাম, ছ'টা।

চন্দ্রকান্ত বললেন, আমরা চললাম। তারপর বললেন, খবর পাবেন।

চন্দ্রকান্ত আর কম্ফু পথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন।

নারাণ বলল, একটু আদা দিয়ে ভাল করে চা করি, কি বলেন?

আমি হাসলাম, গলা জিভ সব বালিতে ছুলে গেছিল।

মাথা নেড়ে বললাম, কর।

ঘড়িতে যখন প্রায় সাড়ে আটটা, তখন বারিরির দিক থেকে একটি মেয়ে-গলার আর্ত চীৎকার কানে এলো হঠাৎ।

নারাণ দৌড়ে এলো আমার কাছে।

আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। পরক্ষণেই আমি দৌড়লাম। দেখি নারাণও তার টাঙ্গী হাতে করে আমার পিছনে আসছে।

ক্যাম্পে কেউই রইল না। কিছুটা উঠে পিছন ফিরে দেখলাম যে, ক্যাম্পের আগুনটা মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। পাকদণ্ডীতে রাতের বেলায় পথ দেখে দেখে আগে আগে চলল নারাণ, কাঁধে টাঙ্গী ফেলে। একটু আগেই বোধহয় আফিং-এর একটা বড় গুলি পুরেছিল ও মুখে।

বারিরি থেকে ডিউ ইউ-ডু-ইট্ পাখিগুলো ডাকছিল। আর কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ বন প্রান্তর পাহাড়ের চূড়া ঢাল সব কেমন

নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছিল।

বারিরিতে পৌঁছে ঘন সেগুন বনের অন্ধকারে ঢুকে পড়লাম আমরা। আজকে বনের কোথাওই অন্ধকার নেই। যেখানে সোজাসুজি চাঁদের আলো পৌঁছয়নি সেখানে একটা রূপোলি আভা জমেছে। মাটিতে নিথর চাঁদের আলোর উপরে কম্পমান ছায়া বাঘবন্দী খেলছে। হাওয়ায় সেগুন পাতা নড়ছে বলে আলো-ছায়া, ছায়া-আলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সেগুনবনে ঢুকেই দেখলাম সেগুনের ওপাশ থেকে দুজন লোক একটি মেয়েকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে বারিরিতে পৌঁছল। মেয়েটি জোরে চেঁচালো একবার। আমি আর নারাণ চমকে উঠলাম। চন্দনী!

ওরা বেশ দূরে আছে, কিন্তু গাল-পোড়া ছবি বেনেকে তার গজকচ্ছপ চেহারায় চেনা যাচ্ছে। সঙ্গের লোকটি তার সাগরেদ—যে সকালে আমার পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়েছিল।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা খুলে নিলাম। আমি আর নারাণ ওদিকে দৌড়তে যাব ঠিক এমন সময়, আমাদের ডানপাশে মচ্‌মচ্‌ করে শুকনো পাতা মাড়াবার আওয়াজ হলো। চমকে তাকিয়ে দেখি চন্দ্রকান্ত।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, ওদের ক্যাম্প একটা ঢাল পেরিয়েই—যেদিক থেকে ওরা এলো, সেদিকে। আপনারা, আমি না ডাকলে বেরোবেন না। ওখানে চুপ করে বসুন।

বলেই, আবার বাঁয়ের জঙ্গলে মিলিয়ে গেলেন।

চন্দনীকে ওরা দুজনে যেন কি করছিল। চন্দনীকে আমলকী গাছের তলায় শুইয়ে ফেলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর লম্বা লোকটা একটু দূরে চলে গেল ছবি নায়েক আর চন্দনীকে ছেড়ে দিয়ে। বাঁ দিকের সেগুনবনের কাছে গিয়ে লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ঠিক সেই সময় রাইফেলের আওয়াজ হলো গুম্‌ম্‌-ম্‌-ম্‌ করে। দূরে দূরে সে আওয়াজ ছড়িয়ে গেল, সেই নির্জন মালভূমি থেকে।

লোকটা সিগারেটটা ধরাতে পারলো না—গুলিটা ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো মাটিতে—কাঁধ থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ল।

গাল-পোড়া বাঁটকুল বেনেটা প্রথমে উঠে বসল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে কোনদিকে দৌড় দেবে ভেবে পেলো না।

ইতিমধ্যে চন্দ্রকান্তকে দেখা গেল রাইফেলটা হাতেই নিয়ে এক-এক-পা করে ছবি নায়েকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হলো, গাল-পোড়াটার বোধহয় গুলি খেয়ে মরার যোগ্যতা নেই; ওকে পিটিয়ে মারা দরকার।

চন্দনীও উঠে বসেছিল। হাঁটু গেড়ে বসেছিল। চাঁদের আলোতে ওর পরিষ্কার শাদা শাড়ি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

চন্দ্রকান্তকে এগিয়ে আসতে দেখে ছবি নায়েক সোজা পাতা-ঝরা আমলকী বনের নীচ দিয়ে আমাদের দিকে দৌড়ল।

টাকাওয়ালা লোক, শুধুই টাকা সর্বস্ব লোক যখন প্রাণভয়ে দৌড়য় তখন দেখতে ভারী মজা লাগে। ওদের বড় মায়া প্রাণের। ওদের অনেক ফোকটাই টাকা আছে বলে ওদের প্রাণের দাম অন্য সকলের প্রাণের দামের চেয়ে বেশী বলে মনে করে ওরা। ওর দৌড়ে আসার ভঙ্গীর মধ্যে ওর পাম্পশু, বাফ্ তার পাঞ্জাবী, তাঁতের ধুতি সবকিছুর মধ্যে একটা ইত্রামি ফুটে উঠছিল।

ও দৌড়চ্ছিল, ওর পিছনে পিছনে চন্দ্রকান্তও।

ছবি যখন একেবারে আমাদের সামনে দিয়ে এসে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল, তখন আমি আর নারাণ ওকে একসঙ্গে ক্যাঁক্ করে ঠেসে ধরলাম। ও অবাক হয়ে মুখটা ফাঁক করল। চাঁদের আলোয় ওর ফাঁক-ফাঁক দাঁতওয়ালা কুচক্রী মুখ আর গালের পোড়া দাগটা চক্‌চক করে উঠল।

ও আমাদের পা ছুঁয়ে বলল, আমাকে মারবেন না, যা চান তাই-ই দেবো। অর্ধনগ্ন নারাণ টাঙ্গীর ডাণ্ডা দিয়ে এক বাড়ি মারল ওর মাথায়। বলল, চুপ কর শালা! একটা শব্দ করেছিস কি শেষ।

আমি পিস্তলটা বের করে ওর মাথায় ঠেকিয়ে রাখলাম।

গাল-পোড়া বেনেটা জলহস্তীর মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখনও চন্দ্রকান্ত বারিরির আধাআধিও আসেননি! এবার দৌড়ে আসছেন।

চন্দনী কিন্তু যেখানে ছিল তেমনিই বসে ছিল।

হঠাৎ পর পর অনেকগুলো গুলির শব্দ হলো রাইফেলের। মনে হলো, চন্দ্রকান্তর ডান পাশ থেকে। দেখলাম, চন্দ্রকান্ত মাটিতে পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। পড়বার আগে যেন অনেকখানি ছিটকে উঠলেন উপরে। দূরের সেগুনবনে অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

ইতিমধ্যে কম্ফু বাঁদিক থেকে এসে পড়ল দৌড়তে দৌড়তে জঙ্গলে জঙ্গলে।

আমাকে বলল, আপনি এক্ষুনি ক্যাম্পে চলে যান।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন? চন্দ্রকান্তকে এভাবে ফেলে যাওয়া যায় না। তারপর উদ্বিগ্ন গলায় শুধালাম, চন্দনী?

কম্ফু বলল, রত্নাকর ফৌজসমেত দারোগাকে নিয়ে এসেছে। ওরা নিশ্চয়ই এক্ষুনি ক্যাম্পে যাবে। ক্যাম্পে আপনার থাকা দরকার। আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, যাত্রা দেখতে গেছি।

আমি আবার বললাম, চন্দ্রকান্ত, চন্দনী?

ওরা বলল, আমরা দেখছি। চন্দ্রকান্ত শেষ। কম করে তিনটে গুলি লেগেছে। আপনি যান। আর কথা বলার সময় নেই।

বহুবার পড়তে পড়তে বেঁচে আমি দৌড়ে নামলাম পাকদণ্ডী দিয়ে। ক্যাম্পে পৌঁছে আগুনটাকে জোর করলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে—কিন্তু সময়টা কি করে যে কেটে গেল বুঝলাম না—জীপের আওয়াজ শুনলাম, আলোও দেখা গেল। দুটো জীপ কাছে এসে থেমে গেল।

সেই সেদিনের দারোগা, জীপ থেকে নেমে একগাল হেসে বলল, এসে দেখুন, আপনাদের হীরো জীপের পিছনে পড়ে আছে। সেদিন বড় বক্তৃতা দিয়েছিল।

দারোগার পিছনে পিছনে জীপ থেকে নেমে রক্তমাখা চন্দনী দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, দেখবে এসো, আমার বরকে ওরা কি করে মেরেছে—কতগুলো গুলি লেগেছে, রক্ত—কী রক্ত! দেখবে এসো। চন্দনীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। অন্যদিকে মুখ ফেরালাম আমি।

দারোগা জীপের বনেটে বসে সিগারেট ধরালো।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, এঁকে শীগগিরই হাসপাতালে নিয়ে যান। এক সেকেণ্ডও দেরী না করে।

দারোগা হাসলো। বলল, ও মরে গেছে অনেকক্ষণ।

হঠাৎ দেখি, রত্নাকর পিছনের জীপ থেকে নেমে এসে দাঁড়াল।

দারোগা বলল, আপনার কাম্পের আর লোকজন কোথায়?

আমি বললাম, সকলেই যাত্রা দেখতে গেছে।

দারোগা বলল, আমার আর কথা বলার সময় নেই। লাশ নিয়ে সদরে যাবো। চন্দনীকে ফেরৎ দিয়ে গেলাম।

বললাম, চন্দনীকে যারা ধরে নিয়ে গেছিল, তাদের নিয়ে যাবেন না সদরে?

দারোগা হাসলো। বলল, ওকে পেলাম, আপনাদের হীরোর সঙ্গে। চন্দ্রকান্তর বুকের উপর উপুড় হয়ে ছিল।

দারোগা জীপ স্টার্ট করে বলল, মেরে ধরে নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। জঙ্গলে এমন আকছার হয়।

রত্নাকর গিয়ে দারোগার পাশে বসল। আমার দিকে ও একবার করুণার চোখে তাকাল।

আমি বললাম, কোথাকার মর্গ থেকে পাবো চন্দ্রকান্তকে?

—সব হবে, সব হবে; তাড়া কিসের? এস-পি নিজে তদন্তে আসবেন কাল সকালে এখানে। তখন আবার উল্টো-পাল্টা বলবেন না যেন তাঁকে, সাবধান। সব বেয়াদবীর মূলে যে, সে তো ঐ পড়ে আছে। ওকে দেখে সকলকে শিখতে বলবেন। তেজ যেন কেউ না দেখায়।

বলেই, কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই, দারোগা তার ফৌজ নিয়ে খুব জোরে জীপ ছুটিয়ে চলে গেল।

চন্দনী একেবারে ভেঙে পড়ল, হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, তোমরা পুরুষ মানুষ নয় গো, তোমরা মরদ নও, আমার এত ভালোবাসার বর, আমার মরদের মতো মরদকে ওরা এমন করে নিয়ে চলে গেল। মুখে একটু জল পর্যন্ত দিলো না, আর তোমরা দেখলে চেয়ে চেয়ে?

দারোগার জীপ চলে যাওয়ার একটু পরই বারিরির দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ শোনা গেল। একবার, শুধু একবার। তারপর আবার সব চুপচাপ।

একটু পরে নারাণ লাফাতে-লাফাতে নেমে এসে বলল, নুন চাই, নুন।

—কি হবে? আমি বললাম।

—ছবির গা কেটে তাতে নুন ভরে দেবো। ওকে গাছে বেঁধে রেখেছি। বারিরিতে বুনো কুকুরের দল আসবে মাঝরাতে। রক্তের গন্ধে ওরা আসবেই আমরা চলে এলে, ততক্ষণ ওকে চিরে চিরে ফালা ফালা করছে কম্ফু। ওর সারা গায়ে নুন দিয়ে রাখব। ও জ্বালাটা বুঝবে, ও বুঝবে যে, এ সংসারে দীনবন্ধু এখনও আছে।

নিরীহ, নির্বিকার আফিংখোর নারাণের চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠল। নারাণ মুখবিকৃতি করে বলল, কুকুরগুলো ওকে খুব্লে খুব্লে খাবে।

চন্দনী পাগলির মতো বলল, আমাকে নিয়ে চল নারাণ ভাই, আমাকে নিয়ে চল।

নারাণ আধবস্তা নুন কাঁধে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল আবার। যেতে যেতে বলল, বোন তুই থাক। আমাদের হাতে ছেড়ে দে ওকে, ছাখ ওকে কি করি আমরা।

চন্দনী আমাকে দেখছিল অবাক চোখে।

অনেকক্ষণ পর ও শুধোলো—যেন অনেক দূর থেকে, কি করবে

এখন তুমি ?

আমি বললাম, জানি না। কিন্তু যেখানেই যাই, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

চন্দনী ভুরু তুলে তাকালো আমার দিকে। ওর চোখে এখন জল ছিল না, আগুন ছিল। মুখে কিছু বলল না।

আমি বললাম, কোলকাতা যাবো, চলো চন্দনী, তোমাকে নিয়ে কোলকাতাতেই যাবো।

চন্দনী খুব আস্তে বলল, না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, যাবে না ? মানে, এখন যেতে চাও না ?

তারপরই বললাম, এখন যাওয়ার তো কথা ওঠে না। চন্দ্রকান্তকে নিয়ে ফিরে আসবো, সৎকার করবো, তারপর যাবো।

—না। চন্দনী আবারও বলল। এবার দৃঢ়তার সঙ্গে।

আমি বললাম, কি হলো ? চন্দনী ? কি, না ? না, কি ?

চন্দনী মাথা নাড়ল দুধারে। বার বার মাথা নাড়ল।

তারপর অস্ফুটে বলল, তুমি ফিরে যাও। আর আমার ভয় নেই।

বারিরিরি দিক থেকে পরপর তিনবার উঃ-উঃ-উঃ-উঃ-উঃ-উঃ করে তীব্র আর্তনাদ উঠলো।

তারপর আবার সব চুপচাপ।

ডিউ-ইউ-ডু-ইট পাখিগুলোর উত্তেজিত ডাক শোনা যেতে লাগল ওদিক থেকে। সেই পাখিগুলোর দূরাগত ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মনে হলো যে, ঐ বধ্যভূমিতে চন্দ্রকান্তর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চন্দনীর, কস্ফুর, নারাণের এমনকি আমারও বুকের একটি শীতল বোধ বুঝি নিহত হয়ে গেছে আজ রাতে। মেরিয়া-বলির মতো আমাদের প্রত্যেকের বুক থেকেও কেউ যেন সমূলে খুবলে তুলে নিয়েছে সেই লজ্জাকর বোধটিকে চিরদিনের মতো। সে বোধের নাম ভয় !

———